প্রকাশক ঃ
কামাখ্যা ভট্টাচার্য
৯ এণ্টনী বাগান লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬০

মুদ্রক ঃ
ষোড়শী প্রেস
হরিপদ জানা
৯ এণ্টনী বাগান লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙ্ঘের
বন্ধুদের করকমলে

নিবেদন

অপসংস্কৃতির বিপক্ষে ও সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে এগারোটি প্রবন্ধের সংকলন এই গ্রন্থ। সুস্থ সংস্কৃতির উপরেই বেশী জোর দিতে চেয়েছি, তাই বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে 'সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে'। বর্তমান সমাজ জীবনে ও সাহিত্যে অপসংস্কৃতি নানাভাবে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, তাই তার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে সুস্থ সংস্কৃতির স্বরূপটিও জনমনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করে দেবার আবশ্যকতা রয়েছে। শেষের কাজটিই বেশী জরুরী। এই দ্বিবিধ প্রয়োজন মনে রেখেই বর্তমান গ্রন্থের সংকলন ও প্রচারণা।

পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকার পাঁচ বৎসর পূর্বে প্রথম দফায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরেই অপসংস্কৃতি দমন ও সুস্থ সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের উদ্দেশ্যে একটি সময়োচিত আবেদন প্রচার করেছিলেন। ওই আবেদন আমরা সেসময় সমর্থন করেছিলাম। বামফ্রন্ট আবার বিপুল জনসর্থন পুষ্ট হয়ে নতুন করে ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। আশা করবো সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে ও অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁদের দ্বিমুখী অভিযান এবার আরও বেশী জোরালো হয়ে উঠবে। সরকারের এই শুভ প্রচেষ্টার সঙ্গে বেসরকারী স্তরে আমাদের সব রকমের সহযোগিতা থাকবে, এই নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারি। এই বইয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধে যেসব কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে, অপসংস্কৃতি রোধে ও সুস্থ সংস্কৃতির ভাবধারা সম্প্রসারে সরকার তা থেকে প্রয়োজনীয় সংকেত গ্রহণ করে লাভবান হতে পারবেন বলে মনে করি। আর পাঠকেরা যে উপকৃত হবেন সে কথা একপ্রকার জোরের সঙ্গেই বলা যায়।

বেণু প্রকাশনীর কর্ণধার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কামাখ্যা ভট্টাচার্য বইখানির প্রকাশে যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

কলিকাতা, নারায়ণ চৌধুরী

লেখকের অন্যান্য বই

সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি (সম্পাদিত)

মানিক-সাহিত্য সমীক্ষা (সম্পাদিত)

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও অন্যান্য

রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত

কাজী নজরুলের গান

সংগীত পরিক্রমা (৩য় সংস্করণ)

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র (২য় সংস্করণ)

লিও টলস্টয় : জীবন ও সাহিত্য (২য় সংস্করণ)

সাহিত্য ভাবনা : নব পর্যায়ে

চতুরঙ্গ

উত্তর-শরৎ বাংলা উপন্যাস

বরণীয় লেখক, স্মরণীয় সৃষ্টি

সুকান্তের কথা (যন্ত্রস্থ)

বাংলার সংগীত ঐতিহ্য (যন্ত্রস্থ ,

Saratchandra Chatterjee : His Life and Literature

Maharshi Devendranath Tagore

(হিন্দী, গুজরাটী, কন্নড় ও তামিল ভাষায় অনূদিত)

আপনি ও আপনার স্বাস্থ্য (অনুবাদ)

ইত্যাদি

সূচীপত্র

অপসংস্কৃতি প্রসঙ্গে

॥ ১ ॥

অপসংস্কৃতির সমস্যা যে আজই প্রথম বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করলো এমন নয়। বাংলায় সুস্থ সংস্কৃতির ধারার যেমন একটা দীর্ঘ দিনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে, তেমনি অপসংস্কৃতির ধারারও একটা পুরাতন আবিল ঐতিহ্য রয়েছে। নির্মল জল আর ঘোলা জলের পাশাপাশি বহমানতার মত এই দুই ধারাও সমানে বয়ে এসেছে বাংলা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-নাট্য-সঙ্গীত ইত্যাদি বিভিন্ন সুকুমার কলার খাত বেয়ে। তবে যেহেতু সুস্থতার শক্তি স্বভাবতই প্রবলতর, অসুস্থতার উপরে সুস্থতার বরাবরই জিৎ, সেই কারণে অপসংস্কৃতির মালিন্য বাঙালী মানসে কোন সময়েই গভীর দাগ কাটতে পারেনি। এখনও পারবার সম্ভাবনা নেই। সংস্কৃতির যেটা অসুস্থতা ও বিকারের ধারা তা কখনও খুব বলশালী হওয়া সম্ভব নয় এই হেতু যে, জাতির মানসিকতায় সম্মিলিত শুভবুদ্ধির সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেক, অনেক বেশী; সেই তুলনায় অপসংস্কৃতির প্রভাব খুবই কম। অপসংস্কৃতির কারবারীরা স্পষ্টতই দৃষ্টিগ্রাহ্য সংখ্যালঘুর কোঠায় পড়ে। শুভের বিরুদ্ধে অশুভের সংগ্রামে অশুভ শক্তি, প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ীই কোণঠাসা হতে বাধ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেমন একদিকে চলেছে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, ভূদেব, অক্ষয়কুমার, দীনবন্ধু, হেম, নবীন, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলার একাধিক বরেণ্য পুরুষের শুদ্ধ ও সুস্থ সংস্কৃতি প্রচারের জোরালো অভিযান, তেমনি তার পাশে পাশে, কখনও মৃদু কখনও উগ্রভাবে, অপসংস্কৃতির অভিযানও চলেছে নেহাত কম নয়। রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রমুখের সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে খিস্তিমূলক গান, কবিয়াল ও তরজা গাইয়েদের খেউড় সঙ্গীত,

পাঁচালী ও হাফ আখড়াই গানের আসরে অশ্লীল রুচির দাপট, নাটকের মঞ্চে সংলাপে ও উপস্থাপনায় কখনও কখনও জেনেশুনে কুরুচির আমদানী, সংবাদপত্রাদিতে বাদানুবাদের ক্ষেত্রে প্রায়শঃ শালীনতার সীমা লঙ্ঘন, বটতলার ছাপমারা উপন্যাস ও অন্যবিধ আখ্যানমূলক কাহিনীতে কেচ্ছার প্রাবল্য—এসব এবং এই জাতীয় আরও নানা ধরণের রচনা ও ক্রিয়াকলাপের হিসাব ধরলে তার পরিমাণটাও বড় অল্প হবে না। বলতে গেলে সুরুচি আর কুরুচির মধ্যে একটা অলিখিত যুদ্ধ সবসময়েই লেগে ছিল। তবে যেহেতু কুরুচির শক্তি হলো অন্ধকারের শক্তি, অসামাজিক মনোবৃত্তির শক্তি, সেই কারণে আলোর সঙ্গে তার পেরে ওঠার কথা ছিল না। স্পষ্টতই ওটা একটা অসম যুদ্ধ, এই যুদ্ধে আলোর জয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। আর কার্যতঃ তা-ই ঘটেছিল। শুভবুদ্ধি ও সুরুচির অনুকূল শক্তি বাঙালীর জাতীয় চিত্তকে অধিকার করে নিয়েছিল।

এই শতকেও একই ধাঁচের ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আজ অবশ্য বটতলা সাহিত্যের পূর্বতন দাপট আর নেই, গানে-নাট্যে কবিয়ালের আসরে খিস্তি-খেউড়ের রেওয়াজটা অবসিতপ্রায়, কিন্তু বটতলার ঐতিহ্য একেবারে মরে গেছে এমন কথা বলা যায় না। বটতলা এখন ভিন্ন নামে ও ভিন্ন পরিচ্ছদে আসর জাঁকিয়ে তুলতে চাইছে। যাকে উঁচুতলার সাহিত্য বলা হয় তাতে আজকাল বটতলার সাহিত্যের খদ্দেরের অভাব নেই, আরও যেটা আশঙ্কার কথা, বটতলা এখন কৌলিন্যের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে সাধু সেজে বসেছে। যে সকল রচনা স্রেফ পর্নোগ্রাফী, যাদের সাহিত্য মূল্য কাণাকড়িও নয়, নিষিদ্ধ পুস্তকের বাজারের সুড়ঙ্গপথের আঁধারেই কেবল যেগুলির বিকিকিনি হওয়া শোভা পায়, সেগুলি এখন শিল্পীর স্বাধীনতার অজুহাতে ও আবরণে অভিজাত সাহিত্যের তকমা গায়ে এঁটে দিব্যি খোলা বাজারের প্রকাশ্য বিপণন-সুযোগ লাভ করছে। বটতলার সাহিত্য এখন আর আহিরীটোলা-গরাণহাটা-শোভাবাজারের গাছতলায় ফেরী হয় না; তা ক্ষেত্র বদল করে আজ বড় বড়

পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠপোষিত 'বাজারী' সাহিত্যের দর-দালানে এসে ঠাঁই নিয়েছে। গরাণহাটা নয়, সুতারকিন স্ট্রীট এখন কেচ্ছা-সাহিত্যের বড় পাইকার।

বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে নতুন করে অপসংস্কৃতির প্রভাব পড়তে থাকে বাংলা সাহিত্যের উপর। নবপর্যায় ভারতী পত্রিকার কিছু কিছু রচনায় এবং কল্লোল-কালিকলম-ধূপছায়া-প্রগতি প্রভৃতি আধুনিক পত্রপত্রিকাগুলির একাধিক লেখায় ব্যাপকভাবে মুক্ত সাহিত্য সৃষ্টির আচ্ছাদনে রুচিবিকারের প্রভাব অনুভূত হয়। তৎকালীন ইংলণ্ডীয়-ফরাসী-স্প্যানিশ-ইতালীয়-স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশগুলির সাহিত্যের দৃষ্টান্তে প্ররোচিত হয়ে বিশেষ করে কল্লোল ও প্রগতি গোষ্ঠীর লেখকেরা (যথা, অচিন্ত্যকুমার, প্রবোধ সান্যাল, যুবনাশ্ব, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ) নরনারীর স্বচ্ছন্দ স্বাধীন মিলনের ছবি আঁকতে গিয়ে দেহবাদের ঢল নামিয়ে দেন। এই অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে শুধু যে তারকনাথ সাধু, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, সজনীকান্ত দাস প্রমুখ মূলতঃ রক্ষণশীল ধাতের সমালোচকরাই প্রতিবাদ করেন তা-ই নয়; এমন কি রবীন্দ্রনাথের মত পরম উদার মুক্তমনের মানুষকেও প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে হয়। কবির বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাহিত্যের ধর্ম' প্রবন্ধটি আর কিছু নয়, কল্লোল কালিকলম প্রগতির অমিতাচারী লেখকদের প্রতি প্রচ্ছন্ন সতর্কবাণী মাত্র। সাহিত্য ও সমাজের শ্রেষ্ঠ কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই কবি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। নবীন লেখকেরা তখন-তখুনি কবির কথায় কর্ণপাত না করলেও পরে তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন ও আপনাদের সংশোধন করে নিয়েছিলেন। তাঁদের আত্মস্থতার প্রক্রিয়া অপসংস্কৃতির বক্র পথ থেকে সুস্থ সংস্কৃতির উন্মুক্ত রাজবর্ত্মে উত্তরণের এক প্রেরণাদায়ক ইতিহাস।

শ্লীল অশ্লীলের বিতর্কে শরৎচন্দ্র প্রথমে তরুণ লেখকদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন, পরে তাঁদের বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হয়ে কবির মতেরই পোষকতা করেন। তিনি তরুণ লেখকদের সংযত হবার

উপদেশ দেন। তিনি তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, যে-দেশ পরাধীন, অভাব-অনটন-ক্ষুধায় নিয়ত জর্জরিত, যে দেশের মুক্তির জন্য জীবনমরণ পণ করে একটা স্বাধীনতার সংগ্রাম চলছে, সে দেশের লেখক যৌনসমস্যা ছাড়া মানুষের জীবনে আর বিষয় খুঁজে পাননা এ তাঁর কাছে একটা ধাঁধার মত মনে হয়। তিনি তাঁদের এই অশ্রদ্ধেয় পথ পরিহারের পরামর্শ দেন এবং সমাজের প্রকৃত অভাব ও দৈন্যের ছবি ফুটিয়ে তুলতে আহ্বান জানান। বৈদেশিক শক্তির পদানত কোন অধীন দেশে পরবশ্যতার জ্বালাটাই সবচেয়ে বড় জ্বালা, বড় মর্মবেদনা। তার ছবি না এঁকে যৌনতার ছবি আঁকাটা একটা ঘোরতর অপরাধ। এতে সাহসেরও পরিচয় নেই বরং আছে ভীরুতার পরিচয়—কর্তব্য এড়িয়ে যাওয়ার দায়িত্বহীনতা। ইংরেজের বিরুদ্ধে লিখলে জেলে যাবার ভয় আছে, নরনারীর সম্পর্কের মুক্তচিত্রণে সে ভয় নেই। তাই নবীন লেখকদের চুটিয়ে যৌন সাহিত্যের চর্চা।

শরৎচন্দ্রের হিতকথায় পুরোপুরি কাজ হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। তা যদি হতো তো পূর্বোক্ত সময়ের চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর পরে অর্থাৎ আমাদের এই সমসাময়িক কালে আবার নতুন করে যৌন সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব ঘটতো না। এখনকার কালের নবীন, আধাপ্রবীণ, কখনও কখনও বয়স্ক লেখকদের একাংশের মধ্যে অপ-সংস্কৃতি আবার নতুন আয়ু নিয়ে ফিরে এসেছে। এঁদের কলমের মুখ থেকে এমন কিছু কিছু লেখা বেরোচ্ছে যেগুলির নিরাবরণতা ও নগ্নতা দৃষ্টে কলমের কালো কালিরও লজ্জায় লাল হয়ে উঠবার উপক্রম। বিবর প্রজাপতি পাতক প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক সমরেশ বসুকে এক্ষেত্রে অগ্রণীর প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে; তবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, সুনীল গাঙ্গুলী, গৌরকিশোর ঘোষ— এঁরাও বড় কম যান না। এ বলে আমায় ছাখ, ও বলে আমায় ছাখ। বর্ষীয়াণ লেখক বুদ্ধদেব বসু স্বর্গত হয়েছেন, মৃতের সমালোচনা করার রীতি এদেশে নেই। তা হলেও এই প্রসঙ্গের আলোচনায়

তাঁর উল্লেখ একেবারে উহ্য রাখার উপায় নেই। বুদ্ধদেব পরিণত বয়সে 'রাতভোর বৃষ্টি' উপন্যাস লিখে শিঙ্ ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকতে চেয়েছিলেন, যেটা খুবই বিসদৃশ ব্যাপার। শেষ বয়সে 'বাজারী' লেখকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য তাঁর মানসিক অপরিপক্কতারই প্রমাণ।

সাহিত্যের এই তো চেহারা। এদিকে নাটকের ক্ষেত্রেও বিপত্তি দেখা দিয়েছে। বাংলা নাটক অনেক দিন পর্যন্ত অপসংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত ছিল, এখন আর সে কথা বলবার জো নেই। এখন নাটকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ক্যাবারে নাচ ঢোকানো হচ্ছে, কোন কোন নাট্যে 'বস্ত্রবিপ্লব' সংসাধনের চেষ্টা চলছে। স্বয়ং চোখে দেখিনি, দেখবার ইচ্ছাও নেই, তবে লোকমুখে শুনতে পাই—বারবধূ, পরস্ত্রী, আসামী হাজির, চৌরঙ্গী প্রভৃতি নাটকে নাকি 'ষ্ট্রীপ-টীজ' অর্থাৎ উন্মোচন লীলার বড়ই আধিক্য। এসবই দর্শক সাধারণের রিরংসা প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে সস্তায় মুনাফা লোটবার অঙ্গ। শিল্পের আচ্ছাদনে মানুষের নিম্নগামী রুচিকে আরও নিম্নগামী করার লোভ দেখিয়ে বাণিজ্য করার সহজ পথ কিছু কিছু থিয়েটার মালিককে এতই অধঃপতিত করে তুলেছে যে দেশের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল দূরস্থান, নাটকের মঙ্গলও তাঁদের চিন্তায় আদৌ স্থান পাচ্ছে না। নাটককে শিল্পভ্রষ্ট করে তাঁরা অপসংস্কৃতির কারবারীতে পরিণত হয়েছেন।

অপসংস্কৃতির এইসব বিভিন্ন প্রবণতা ও লক্ষণকে আমাদের সর্ব প্রযত্নে প্রতিরোধ করতে হবে। অপসংস্কৃতির মানেই হলো মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে বিপথে চালিত করবার পরিকল্পিত অপচেষ্টা, তার সংগ্রামী মনোভাবকে পরাজিত করার চক্রান্ত। এই চক্রান্তকে পর্যুদস্ত করবার জন্য কোন চেষ্টাই বাকী রাখা উচিত নয়। অপসংস্কৃতির নির্জিতকরণে আমাদের সকলের সম্মিলিত শক্তি উদ্বোধিত হোক।

॥ ২ ॥

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার কিছুকাল মধ্যেই এক বিবৃতির মারফতে বাংলার সুস্থ সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষা এবং অপসংস্কৃতির প্রতিরোধ-কল্পে জনগণের সামনে এক আবেদন রেখেছিলেন। এই আবেদন আমরা অত্যন্ত সময়োচিত বলে মনে করি। কেননা কিছুকাল যাবৎ সন্ত্রস্ত হয়ে লক্ষ্য করেছি বাংলার শিল্প-সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতির সুস্থ ঐতিহ্যকে উপেক্ষা ও অবমাননা করে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক প্রয়াসকে অপসংস্কৃতির খাতে চালিত করবার একটা পরিকল্পিত চেষ্টা দেখা দিয়েছে কোন কোন মহলে. সাহিত্যে অশ্লীলতা, নাটকে কুরুচিপূর্ণ দৃশ্যের প্রাধান্য, সিনেমায় সেক্স ও ভায়োলেন্সের দাপট, আধুনিক বাংলা গানের ক্ষেত্রে বিকৃত অর্থদ্যোতক কথার সঙ্গে সুরের কোলাহল, বারোয়ারী পূজা উৎসবের কালে ধর্মের আবরণে তামসিকতার চর্চা, যুবসম্প্রদায়ের একটি বড় অংশের মধ্যে আত্যন্তিক আমোদ প্রবণতা ও নেশাসক্তি—এসব এবং এই জাতীয় আরও অনেক উৎকট লক্ষণ ও আচার-আচরণ বাংলার দীর্ঘদিনের সযত্নলালিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ-গুলিকে দলিত ও ভূলুণ্ঠিত করবার উপক্রম করেছে।

এগুলিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে করবার কারণ নেই। আপাত-দৃষ্টিতে অপসংস্কৃতির বিভিন্নমুখী প্রকাশগুলির মধ্যে যোগসূত্র কিছু না থাকলেও একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে সেগুলি অসম্পর্কিত নয়। বেশ একটা মতলবী পরিকল্পনা মাফিক সাহিত্য-নাট্য-চলচ্চিত্র-সঙ্গীত যুব-আন্দোলন ইত্যাদির ক্ষেত্রে অপসংস্কৃতির অভিযান চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং ওই অভিযানের নেপথ্যে অনেক পাকা মাথা কাজ করে চলেছে বলে সন্দেহ হয়।

মতলবী পরিকল্পনাটা আর কিছু নয়, বাংলার সুস্থ সংস্কৃতির ঐতিহ্য ধ্বংস করে জনগণের, বিশেষতঃ তরুণ সম্প্রদায়ের সংগ্রামী চেতনাকে বিপথগামী করা। বাংলার একটা অনেক কালের বৈপ্লবিক মানসিকতা আছে। সেই বৈপ্লবিক মানসিকতা আমাদের শিখিয়েছে

অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করতে, সামাজিক অসাম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, অত্যাচার দমন করতে। এখন কোনও উপায়ে যদি এই বৈপ্লবিক মানসিকতার প্রভাব খর্ব করা যায়, দেশবাসীর চেতনাকে শ্লথতা, আলস্য ও চিন্তাশৈথিল্যের অভিমুখে চালনা করা যায়, তাহলে কায়েমীস্বার্থবাদীদের, অর্থাৎ সমাজের বর্তমান টাল-মাটাল অবস্থাকে টিকিয়ে রাখায় যাদের শ্রেণীগত স্বার্থ আছে, তাদের অর্ধেক কাজ আপনা থেকেই হাঁসিল হয়ে যায়। লোকের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, প্রতিঘাতের চেতনাকে দুর্বল করে দিতে পারলে আর কিছু চাই না, তখন সমাজের অন্যায়সুবিধাভোগী শ্রেণী সমাজকে যে পথে চালাতে ইচ্ছা করবে সেই পথেই সমাজ চলতে বাধ্য। শিল্প-সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার জগৎ হলো সজাগতা চর্চার জগৎ। সেই সজাগতাকেই যদি কোনক্রমে পঙ্গু করে দেওয়া চলে তো সমাজবিরোধী অভিসন্ধিপরায়ণ শক্তিগুলির আর কী সাধ অপূরণ থাকতে পারে? বস্তুতঃ, অপসংস্কৃতির কারবারীদের এই হলো মনস্তত্ত্ব, আর এই মনস্তত্ত্বের প্ররোচনাতেই তারা দেশের সুস্থ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যেন-তেন-প্রকারেণ বিবরাশ্রিত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

'বিবর' কথাটা অপসংস্কৃতির আলোচনার অনুষঙ্গে বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে। সুস্থ সংস্কৃতি হলো উজ্জ্বল রৌদ্রালোকের সংস্কৃতি, আর অপসংস্কৃতি হলো বিবরের অন্ধকারের সংস্কৃতি। আলো থেকে অন্ধকারের দিকে সংস্কৃতির মুখ ঘুরিয়ে দেওয়াই অপসংস্কৃতির বেসাতিওয়ালাদের কাজ।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সুস্থ ঐতিহ্যের কথাটা নেহাৎ কথার কথা নয়। এই ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দীর্ঘ দিনের অভিনিবিষ্ট চর্চার ফলে এর কলেবর পুষ্ট হয়েছে। আধুনিককালের পরিপ্রেক্ষিতে রাজা রামমোহনকে যদি এই সংস্কৃতির আরম্ভ-বিন্দু ধরা যায়, তাহলে ওই সংস্কৃতির দূরবিস্তৃত পরিক্রমার পথে এঁদেরকে বিশিষ্ট ভূমিচিহ্ন জ্ঞান করা যায়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, অক্ষয়কুমার,

আচার্য ভূদেব, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, মীর মশারফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহন-বিপিনচন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দর, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, অরবিন্দ-চিত্তরঞ্জন-সুভাষ, অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র-নন্দলাল-যামিনী রায়, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, আচার্য জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র-মেঘনাদ-সত্যেন বোস, হরিশচন্দ্র-শিশিরকুমার-মতিলাল-রামানন্দ, স্বর্ণকুমারী-সরলা-অনুরূপা-নিরুপমা দেবী এবং এঁদের অনুরূপ আরও অনেকে। এই সব দিক্‌পাল মনস্বী ও মনস্বিনীরা নানাভাবে বাংলা সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের সেবা করে গেছেন এবং তাঁদের একনিষ্ঠ সেবার ফলে বাংলা সংস্কৃতির যত্ন-বিবর্ধিত তরু ফুলে-ফলে শোভিত হয়ে উঠেছে। তার সুবাস ও সৌন্দর্য দুই-ই এযাবৎকাল পর্যন্ত আমাদের মাতিয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান বাঙালী জাতি এঁদেরই সম্মিলিত সাধনার দানে গড়ে উঠেছে এবং আধুনিক বাঙালীর চিন্তায় ও চেতনায় এঁদেরই মানসিকতার ছাঁচ লক্ষ্য করা যায়।

আশঙ্কার কথা হলো এই যে, আমাদের এই জাতীয় ছাঁচটাকেই বিপর্যস্ত করবার একটা অভিসন্ধিপ্রণোদিত প্রয়াস ইদানীং উৎকট হয়ে চোখে পড়ছে। তার ফলে দেশবাসীর মনন-মানসিকতা-দৃষ্টিভঙ্গীর গোটা আদলটাই বদলে যাবার উপক্রম হয়েছে। এ সম্ভাবনাকে আমরা ভয়ের দৃষ্টিতে না দেখে পারি না। যেসব পূর্বাচার্য-পূর্বাচার্যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের কাছ থেকে আমরা এই শিক্ষাই পেয়েছি যে, কতকগুলি শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধকে জীবনে লালন করতে হয়, যার দ্বারা জীবন সুন্দর ও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এই জীবন-পরিকল্পনার মধ্যে অসুস্থ মনোবিকারের কোন স্থান নেই, স্থান নেই ক্লিন্ন মনোভাবের। আমাদের সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকেরা তাঁদের গল্পে উপন্যাসে কাব্যে জীবনের ও মানুষের যে ছবি এঁকেছেন তার থেকে বাঁচার সংগ্রামের পথে অগ্রসর হবার প্রেরণাই সতত আমরা পাই, পেছিয়ে যাবার মন্ত্রণা তার ভিতর নেই। বাংলা সাহিত্যে বিজাতীয় পশ্চিমী সংস্কৃতির অনুকরণে দেহবাদকে আশ্রয়-

করে গড়ে ওঠে নি, নরনারীর কামায়নকে এ সাহিত্যে মোটেই আমল দেওয়া হয় নি। নরনারীর মিলনেচ্ছার শোভন মার্জিত সুরুচিপূর্ণ সংস্কারটাই হলো আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বহুলগ্রাহ্য প্রবহমান সংস্কার; সেই সংস্কারের পথই আমাদের কাব্যে ও সাহিত্যে বরাবর অনুসরণ করা হয়েছে, অন্ততঃ কল্লোল যুগের আগে পর্যন্ত। কল্লোলের লেখকরাই প্রথম ইংরেজী, ফরাসী ও অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের সাহিত্যের দৃষ্টান্ত প্রভাবে নরনারীর অবাধ মিলন, যাকে তাঁরা 'প্রেমের মুক্তি' বলেন—তার সংস্কারকে প্রশ্রয় দেন এবং সেই প্রশ্রয়ের রাজপথেই অপসংস্কৃতির কলি প্রথম বাংলা কথা-সাহিত্যে প্রবেশের সুযোগ পায়। তারপর ক্রমেই এ জিনিস জাঁকিয়ে বসতে চাইছে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় এবং আজও সে প্রক্রিয়ার বিরাম হয় নি। বরং আজই যেন তা আরও বেশী ফুলে-ফেঁপে উঠতে চাইছে অনুকূল বাতাসের ব্যজন-তাড়না লাভ করে। যাকে আমরা 'বাজারী' সাহিত্যের মহল বলি, সেই মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় দেহবাদ বা অশ্লীলতা আজকের সাহিত্যের এক প্রধান সমস্যা হয়ে উঠেছে। দিন দিন এই সমস্যার তীব্রতা বাড়ছে অপসংস্কৃতিওয়ালাদের কারসাজিতে।

বাংলা নাটকে ও যাত্রায় কোনও কালে কুরুচির স্পর্শদোষ ঘটেনি—একেবারে হাল আমলের আগে পর্যন্ত। তার শিল্পগত ও অন্যান্য দিকের অনেক ত্রুটি ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু অশ্লীলতা কিংবা অশালীনতার অভিযোগ বাংলা নাটকের উপর কোন সময়েই আরোপ করার উপায় ছিল না। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' কিংবা 'সধবার একাদশী' নাটকে কিছু কিছু রুচিপীড়াকর উক্তি আছে কিন্তু সে-সব উক্তি বাস্তবতা তথা স্বাভাবিকতার প্রয়োজনেই ওই দুটি নাটকের মধ্যে গ্রথিত করা হয়েছিল, দর্শকচিত্তকে রিরংসার প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য নয়। বাংলা নাটক তার অন্যবিধ অপূর্ণতা সত্ত্বেও কোন সময়েই রুচিবিকারের পরিচয় দিয়ে তার সুস্থ ঐতিহ্যকে মলিন করে নি।

আজ আর সে কথা বলবার যো নেই। এখন নাটকে অকারণে

ও নিতান্ত আচমকা লাস্যচটুল বিলোল ভঙ্গিমায় নৃত্যের অবতারণা করা হয় এবং নৃত্যকারিণীর বাসের স্বল্পতা রুচিবাগীশ নয় এমন দর্শকেরও লজ্জার কারণ হয়ে ওঠে। থিয়েটারেই শুধু এই নগ্নতা সীমিত নয়, থিয়েটারের মঞ্চকে ছাপিয়ে আজ এই নিরাবরণতার প্রদর্শনী যাত্রামঞ্চকেও আক্রমণ করেছে। সংস্কৃতিচর্চার একটি মুখ্য বাহন অপসংস্কৃতির কলুষস্পর্শে ক্লিন্ন হয়ে উঠবার উপক্রম হয়েছে। কুরুচির এই ঘোলাজলের স্রোতে এখনই যদি শক্ত হাতে বাঁধ না বাঁধা যায় তাহলে গোটা নাট্য ও যাত্রাপালার সংস্কৃতিই একদিন অপসংস্কৃতির আবিলতার বন্যায় ডুবে যেতে পারে। কলকাতার চৌরঙ্গীপাড়ার নাইট-ক্লাবগুলিতে আমরা ক্যাবারে নাচের কথা শুনে থাকি। সেই ক্যাবারে নাচ আজকাল অভিজাত হোটেল-রেস্তোরাঁ-গুলির নৈশ বিপণনের খরিদ্দার আমোদবিলাসী ভোগী সম্প্রদায়ের বিচরণের ক্ষেত্র অতিক্রম করে উত্তর কলিকাতার নিরীহ মধ্যবিত্ত দর্শক—যাদের মধ্যে ছাত্র ও তরুণের সংখ্যা খুবই বেশী—পৃষ্ঠপোষিত সাধারণ নাট্যশালাগুলিতে অনুপ্রবেশ করেছে—এর চেয়ে ক্ষোভের বিষয় আর কী হতে পারে। কয়েকটি নাটক তো এ ব্যাপারে ইতি-মধ্যেই যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করেছে।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বোম্বাই-মার্কা হিন্দী সিনেমা-ছবির দাপট একটা রীতিমত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব ছবির অধিকাংশই এমন ফর্মূলা মাফিক তৈরী করা হয় যার প্রভাব দর্শকদের রুচিকে নিম্নগামী না করেই পারে না। বোম্বাইয়ের চিত্রপ্রযোজকদের বাণিজ্যিক ফর্মূলার প্রধান কথাই হলো সেক্স ও ভায়োলেন্স। অর্থাৎ যৌনতা ও হিংসাচার। কাহিনীকে এমনভাবে সাজানো হয় যাতে তার ভিতর এ দুটি বস্তুর প্রাধান্য থাকে। উদ্দেশ্য সরলমনা দর্শকদের বিভ্রান্ত করা ও সেই সুযোগে বক্স-অফিসের সঞ্চয় স্ফীত থেকে স্ফীততর করে তোলা। ছবির উপর 'কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' ছাপ এঁটে দিয়ে নিষিদ্ধ ফলের আকর্ষণ সৃষ্টি করে দর্শক সমাজ, বিশেষ করে তার কোমলমতি তরুণবয়সী অংশকে প্রলোভিত করে

মুনাফা-মৃগয়াবৃত্তি চরিতার্থ করা হিন্দী ছবির প্রযোজক ও পরিবেশক-দের ঘৃণ্য কৌশলগুলির অন্যতম। এরা শিল্পের ধার ধারে না, রুচির ধার ধারে না, সমাজের উপর এ-জাতীয় ছবি দেখানোর ফল কী হতে পারে সে হিসাব যাচাই করে দেখার প্রয়োজনের ধার ধারে না, শুধু যেন-তেন-প্রকারেণ পয়সা কামাই করাই এদের একমাত্র লক্ষ্য। এদের পরিকল্পিত চক্রান্তে কত ভাল ভাল ছবি যে সময়মত প্রদর্শনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তার আর ইয়ত্তা নেই। বাংলা ছবির শিল্পগত মান হিন্দী ছবির তুলনায় সচরাচর উন্নত, কিন্তু বাংলা ছবির নির্মাতাদের অর্থবল কিংবা সংগঠনগত বল হিন্দী ছবির নির্মাতাদের তুলনায় অনেক কম। শুধু সেই কারণে বাংলা ছবি সাংস্কৃতিক মানে সমধিক উৎকর্ষশীল হয়েও বোম্বাইয়ের ছবির দুনিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগি-তায় এঁটে উঠতে পারে না। কত যে ভাল ভাল বাংলা ছবি এই ভাবে অসম আর্থিক প্রতিযোগিতার শিকার হয়ে অন্যায় ভাবে মার খেয়ে যায় তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। চলচ্চিত্রের শিল্পোৎকর্ষ বজায় রেখেও তাকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করা—এও বাংলার সাম্প্রতিক সংস্কৃতির এক প্রধান সমস্যা।

অপসংস্কৃতি বনাম সুস্থ সংস্কৃতির বিতর্কের প্রসঙ্গে আমি শুধু এখানে সাহিত্য, নাট্য ও সিনেমা এই তিনটি বিষয় নিয়েই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করলাম। এছাড়াও অপসংস্কৃতির আরও অনেক সমস্যা আছে। পরের প্রবন্ধে সেগুলির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করা বে।

সমাজ জীবনে অপসংস্কৃতির দৌরাত্ম্য

পশ্চিমবাংলার শাসনক্ষমতায় আজ প্রায় পাঁচ বছর হলো বামফ্রন্ট অধিষ্ঠিত আছে। বামফ্রন্ট কর্তৃক সরকার গঠন ও পরিচালন পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে নতুন তাৎপর্যের জন্ম দিয়েছে। কেননা এ শুধু সরকারী ক্ষমতায় নিছক দলবদল নয়, একটা আদর্শগত সংস্থানেরও বদল। বামফ্রন্ট সকল কাজে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলবার পক্ষপাতী এবং সমাজের নির্যাতিত শোষিত স্তরের মানুষদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য দায়বদ্ধ। ফলে এই সরকারের কাজের ধারা পূর্ববর্তী সরকারের কাজের থেকে বেশ স্বতন্ত্র রকমের হওয়াই সম্ভব। আশার কথা নানা ক্ষেত্রে ধরা তার সূচনাও দেখা গিয়েছে।

এ সরকারের কাছে আমাদের অনেক কিছু প্রত্যাশা—রাজনীতিগত, অর্থনীতিগত, সমাজগত এবং সংস্কৃতিগত। কিন্তু আজ এখানে আমি শুধু কয়েকটি সমাজগত ও সংস্কৃতিগত প্রত্যাশার কথাই বলব। রাজনীতি ও অর্থনীতির আলোচনার জন্য আমাপেক্ষা অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি আছেন, তাঁদের কাজ তাঁরা যাতে অবাধে করতে পারেন তার জন্য ক্ষেত্র উন্মুক্ত রেখে এখানে আমি সমাজ ও সংস্কৃতির দুই একটা সমস্যা নিয়ে কিছু কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে চাই। বামফ্রন্ট সরকারের পরিচালকবর্গের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হলে আমার চেষ্টা সার্থক মনে করবো।

পশ্চিমবাংলার সরকারী ক্ষমতায় কংগ্রেসই থাকুন আর বামফ্রন্ট সরকারই থাকুন এটা ভুলে গেলে চলবে না এদেশ রামমোহনের দেশ, বিদ্যাসাগরের দেশ, রবীন্দ্রনাথের দেশ। এই সব বরেণ্য মহাপুরুষেরা তাঁদের জীবনব্যাপী সাধনায় কতকগুলি বিশিষ্ট শ্রেয়োবোধ বাঙালী জাতির চেতনায় সংগ্রথিত করে গেছেন। আমরা আর যাই করি আর তাই করি, এঁদের প্রবর্তিত ও প্রচারিত মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে

ভ্রষ্ট হওয়ার আমাদের কোনই অধিকার নেই। আমরা যদি এঁদের শিক্ষা ভুলে গিয়ে আজ বিপরীতাচরণ করি সেক্ষেত্রে শুধু যে এঁদের স্মৃতির প্রতিই অবমাননা করা হবে তাই নয়, দীর্ঘদিনের সাধনায় অর্জিত সুফলকে বিনষ্ট করার দায়ও আমাদের মাথায় পেতে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা বিপথগামী বলে প্রতিপন্ন হবো।

বাংলার জাতীয় সংস্কৃতিতে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় 'দাম যুক্তিবাদ। যুক্তিবাদ বা র‍্যাশানালিটি সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও তামসিকতার শত্রু। পূর্বোক্ত তিন মহাপুরুষ এবং তাঁদের অনুবর্তী আরও যাঁরা তাঁদের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন (যেমন 'ইয়ং বেঙ্গল' বা ডিরোজিয়ান দল, ডেভিড হেয়ার, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক বঙ্কিমচন্দ্র [নবহিন্দুত্বের প্রচারক নন], শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ, রবীন্দ্রানুসারী ভাবুকগণ, প্রভৃতি) তাঁদের চিন্তাচর্চা ও নানা বিষয়ক পর্যালোচনার ফলে আমরা এই জেনেছি যে, ব্যক্তি ও সমাজজীবনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুশীলন একটা অবশ্যকৃত্য, তার থেকে বিচ্যুত হলে সেই বিচ্যুতির রন্ধ্রপথে নানাপ্রকার অতিপ্রাকৃতবাদ, অলৌকিকের কুহক, অপ্রত্যক্ষের ভয় (ভূতের ভয়ও এই পর্যায়ে পড়ে) অরক্ষিত যে-মন, তার ভিতরে জাঁকিয়ে বসবার সুযোগ পায়। আমাদের দেশে প্রথার অত্যাচার একটা সাংঘাতিক অত্যাচার, তা ক্রমাগত অগ্রসরমুখী মনকে পেছু হটবার কুমন্ত্রণা দেয়। দীর্ঘদিনের অন্ধ-বিশ্বাসে আচরিত অর্থহীন নিয়ম-কানুন প্রায়শঃ শৈবালদামের মত জড়িয়ে থেকে চিন্তার সচল গতিস্রোতকে অবরুদ্ধ করে দেয়, তাকে সামনে এগোতে দেয় না। এই প্রথাবদ্ধতার অক্টোপাশ বন্ধনের উপর যদি আবার অতিপ্রাকৃতবাদের ভূত এসে ঘাড়ে চাপে তাহলে তো সোনায় সোহাগা। সেক্ষেত্রে অতিবড় প্রগতিপ্রয়াসী মনেরও রক্ষণশীলতার আঘাটায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মরা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। বলে গিয়ে লৌকিক নামে যে সব বস্তু কথিত ও পরিচিত তারই পীড়নের সীমা-পরিসীমা নেই, তার উপর যদি আবার

অলৌকিকের মায়া এসে ভর করে তাহলে তো আর কথাই নেই। লৌকিকে অলৌকিকে মিলে তখন কুসংস্কারের ছয়লাপ হওয়া শুধু বাকী থাকে।

ভক্তি জিনিসটা ভাল কিন্তু তার আতিশয্য মন্দ। তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তাকে চটকানো হয়, তার থেকে কটুগন্ধ নির্গত হতে থাকে। আমাদের বাংলার যুবসমাজের একটা দীর্ঘদিনের সংগ্রামী ঐতিহ্য ছিল, ছিল বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের একটা প্রশংসনীয় পূর্ব ইতিহাস। সেই গৌরবজনক পূর্ব ইতিহাস ভুলে গিয়ে এখনকার কি গ্রামীণ কি নাগরিক যুবসম্প্রদায়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যদি ভক্তিতে গদগদ হয়ে ভাবাবেশের ধুলিধূসরিত আঙিনায় কেবলই গড়াগড়ি খেতে থাকে আর মাঝে মাঝে ধুলিশয্যা ছেড়ে উদ্‌ভ্রান্ত মত্তবৎ উদ্বাহু নৃত্য শুরু করে দেয়, সেক্ষেত্রে শঙ্কিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। বাংলার তরুণ সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য কি এতটাই ক্ষীণ হয়ে এসেছে যে তাদের ভক্তির কাদাজলে মোষের মত গা চুবিয়ে বসে থাকা ছাড়া তারা আর মহত্তর কিছু করণীয় খুঁজে পাচ্ছে না ?

"ভোলে বাবা পার করে গা"

কেন এই আক্ষেপোক্তি দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই পাঠক তার মর্ম বুঝতে পারবেন। এই যে বছরের যে কোন সময়ে, শ্রাবণ মাসেই সবচেয়ে বেশী, ফিটফাট সব যুবকের দল, গায়ে সিল্কের গেঞ্জি, পরনে সাদা হাফ-প্যাণ্ট, কোমরে গামছা জড়ানো, কাঁধে ঘুঙুর পরানো বাঁকে করে গঙ্গার জল পঁচিশ তিরিশ মাইল দূরে থেকে বয়ে নিয়ে গিয়ে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরের শিবের মাথায় চড়াতে যায় তার অদ্ভুতত্ব, হাস্যকরতা, অবিশ্বাস্যতা কেউ কখনও তলিয়ে বিচার করে দেখেছেন কি ? এইসব "ভোলে বাবা পার করেগা"র দল গঙ্গার জল শিবের মাথায় চড়িয়ে কী চতুর্বর্গ ফল লাভ করছে তা তারাই জানে,

তবে দেখে সন্ত্রস্ত বোধ করা ছাড়া উপায় নেই যে, একটা ব্যাপক সংক্রামক ব্যাধির মত এই হিড়িক গ্রাম শহর নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর যুবক, তরুণ ছাত্রসমাজের একটা বড় অংশের মধ্যে ক্রমেই অধিক পরিমাণে শিকড় গেড়ে বসবার উপক্রম করেছে। আজকাল আর এই তথাকথিত পুণ্যস্পৃহা শুধু তরুণ ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, তরুণীরাও এই পুণ্যের অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শুনতে পাই শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত যাতায়াতের পথে দীর্ঘ-যাত্রীদের অভ্যর্থনা ও বিশ্রামের জন্য ব্যাঙের ছাতার মত কত যে 'চটি' গজিয়ে উঠেছে তার লেখাজোখা নেই। এইসব পুণ্যলোভাতুর তরুণ-তরুণীদের শ্রেণীচরিত্র বিচার করলে দেখা যায় এদের মধ্যে অনেক সম্পন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েরাও আছে। আগে শুধু গ্রামের কিংবা শহরের অসচ্ছল মেহনতি ঘরের ছেলেরাই এই তীর্থাভিযানে যোগ দিত, এখন অতিশয় অবস্থাপন্ন ঘরের যুবক-যুবতীদেরও এর সামিল হতে আটকাচ্ছে না। এমনকি বালীগঞ্জের কিংবা নিউ আলি-পুরের অতি আধুনিক-আধুনিকারাও "ভোলে বাবা পার করে গা" দলের খাতায় নাম লেখাতে ইতস্ততঃ করছে না।

কালে কালে কত না অসম্ভব কাণ্ড আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে। যুবকেরা বাংলার দীর্ঘদিনের গৌরবমণ্ডিত বৈপ্লবিকতা, সংগ্রাম আর আত্মত্যাগের ঐতিহ্যে জলাঞ্জলি দিয়ে কোন্ এক কল্পিত পুণ্যের লোভে তারকেশ্বরের ভোলাবাবার মাথায় ভারে ভারে জল চাপাতে যাচ্ছে. এ দৃশ্যের অসঙ্গতি, অবাস্তবতা আর অদ্ভুতত্ব ভাবতে গেলেও বিস্ময়কর-তার তল খুঁজে পাওয়া যায় না। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের দেশে এ কী সর্বনাশা যুক্তিনাশা তামসিকতার চর্চার ঘোলা জলের ঢল নেমেছে। দেশের আশাভরসার স্থল ছেলেমেয়েরা যদি পারত্রিক পুণ্যের জন্য এমন হন্যে হয়ে ওঠে তো ইহকালের কাজ তারা কখন করবে? ইহকালের কাজ করবার জন্য যে মন ও মননের দরকার, তা কি এমন সব ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে আশা করা যায়?

"সন্তোষী মা"

বছর কয়েক আগে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে মালদহে গিয়েছিলাম। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা খেদ জানিয়ে বললেন, আজকাল আব সাংস্কৃতিক সভা-সমিতিতে কলেজের ছেলেমেয়েরা আসে না। তারা সব ওই কি বলে "সন্তোষী মার" পূজানুষ্ঠানে যোগ দিতে যায় কিংবা "সন্তোষী মার" জীবনী অবলম্বনে রচিত ফিল্ম দেখতে সিনেমা হলে ভিড় করে। সন্তোষী মা কী বস্তু আমি জানতুম না, ও-ই প্রথম নামটি আমার কর্ণগোচর হলো। জিজ্ঞাসা করতে উদ্যোক্তারা জানালেন সন্তোষী মা নাকি উত্তরপ্রদেশের এক সাধিকা মহিলা, অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের নায়িকা। এখন বাংলার ঘরে ঘরে তাঁর নাম ও ভজনা। শুনে তাজ্জব বনলুম। স্কুল-কলেজের ছেলে-ছোকরারা অথবা উঠতি প্রজন্মের তরুণেরা খেলার মাঠে যায়, সিনেমা থিয়েটার দেখে, রাজনৈতিক সভাসমিতি করে, আলোচনা-সভা ডাকে, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় এসব জানতুম কিন্তু দল বেঁধে সাধিকা মায়ের পূজা মণ্ডপে ভিড় করে এ জিনিস জানতুম না। বাংলার যুবশক্তির এ কী অধঃপতন, অনুচিত বস্তুকে ঘিরে এ কী ধরনের উৎসাহ! তরুণ বয়সে এমনতর ধর্মমোহ, ধর্মামোদ তো ভাল কথা নয়। যে বয়সের যেটা। ছেলেরা দৌড়ঝাঁপ করবে, খেলাধুলা করবে, সংস্কৃতি সাহিত্য শিল্পচর্চা করবে, এইটেই স্বাভাবিক এইটেই প্রত্যাশিত। কিন্তু তা না করে তারা যদি কোন্ এক সন্তোষী মায়ের আরাধনায় বুঁদ হয়ে ওঠে তো বড় ভয়ের কথা। এ তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, এ যে স্বাস্থ্যের বিকার। ছাত্রবয়সে ধর্মের পাগলামি একটা ব্যাধি রূপেই গণ্য হওয়া উচিত।

পরে কলকাতায় ফিরে দেখলাম আমি সন্তোষী মার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনবহিত থাকলে কী হবে, পাড়ায় পাড়ায় তাঁর নামে আখড়া গজিয়ে উঠেছে। বরানগর অঞ্চলে নাকি তাঁকে কেন্দ্র করে রীতিমত সাধন ভজনের আসর জমে উঠেছে। কী ভয়ের কথা! তার উপর

আছে মারিজুয়ানা ম্যানড্রেক প্রভৃতি মাদক সেবনের কেন্দ্র, সাট্টা খেলার আড্ডা, আরও নানারকমের বিসদৃশ অভ্যাসচর্চার ঘাঁটি। আমাদের তরুণেরা লক্ষ্যহীনতার স্রোতে ভাসতে ভাসতে কোন সর্বনাশের আঘাটায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে ভাবতে গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কোথায় ছেলেরা নানাবিধ স্বাস্থ্যপ্রদ বহির্মুখী কর্মোন্মাদনায় মেতে উঠে আপনাদের তারুণ্যের ব্যক্তিত্বের প্রসার ঘটাবে, তা নয়, সবাই পূজার্চনা নেশা ভাঙ ইত্যাদিতে জমে উঠে শিবনেত্র হয়ে ওঠার যো হয়েছে। একেই বলে বিপরীত বুদ্ধি! যুক্তির বিরুদ্ধে চলার এই ঝোঁক যদি অচিরে প্রতিরুদ্ধ না হয় তাহলে আমাদের দেশের অমিত সম্ভাবনাময় যুবশক্তির সাংঘাতিক অপচয় ঘটে মহতী বিনষ্টির সম্ভাবনা। সেটা দেশের পক্ষে খুবই আশঙ্কার কথা।

সাঁইয়ের ভেলকি

বাংলার যুক্তিবাদী সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশ ও অগ্রগতির পথে আর একটি বড় বাধা দেখা দিয়েছে "সাঁইবাবা" তন্ত্রের প্রভাব। "ভোলে বাবা পার করে গা" কিংবা "সন্তোষী মা"র মতই এই তন্ত্রের প্রভাব বাঙালী মানসিকতার স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর হতে বাধ্য। কোন সাঁইবাবা জাতীয় গুরু মহারাজের প্রতিই কটাক্ষ করতে চাইনে, তিনি তাঁর সাধন ভজন ঈশ্বর পূজা নিয়ে ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে মঠে কিংবা আশ্রমে বিরাজ করতে থাকুন তাতেও আপত্তি করবার কিছু নেই; তাই বলে ঈশ্বরের মহিমা প্রচারের নামে জাদুবিদ্যা তুকতাকের আশ্রয় নিয়ে সাধারণের মনে ভেল্কি লাগানোর চেষ্টা—এ সহ্য করা যায় না। হাত সাফাইয়ের খেলা দেখিয়ে শূন্য থেকে ঘড়ি কিংবা আর কোন সুদৃশ্য মহার্ঘ্য বস্তু আমদানী করা (এই বস্তুটি হাতের তেলোর মাপের চেয়ে কখনও বড় হয় না সেটি লক্ষণীয়) অথবা গুরুজীর ফটোর গা বেয়ে সুগন্ধি বিভূতি ঝরানো—এসব ম্যাজিক

প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমী ব্যক্তি কোন কালেই দেখিয়ে দর্শককে তাক লাগাতে যাবেন না। এমন কি সাধারণ হঠযোগীরও অনাচরণীয় এসব নগণ্য জাদুক্রিয়ার প্যাঁচ।

ঈশ্বরতন্ময়তার সঙ্গে অলৌকিকের কোন সম্বন্ধ নেই। সেকথা শ্রেষ্ঠ-যোগী পরমহংসদেবের জীবন পর্যালোচনা করলেই দেখা যায়। এ অতি নীচুস্তরের কসরৎ যার মায়ায় কোন মানুষেরই ভোলা উচিত নয়। অতিপ্রাকৃতের কুহক যুক্তির ঘোরতর শত্রু। রামমোহন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথের দেশ এই বাংলায় এই ত্রয়ী মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে যুক্তির পথে যাঁরা চলতে চান তাঁদের সকলেরই অতিপ্রাকৃত কিংবা অপ্রাকৃতের বিপদ সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। সাঁই-বাবা জাতীয় চাঁইরা ধর্মচর্চার নামে প্রকারান্তরে অপসংস্কৃতিরই পোষকতা করেন। বাঙালী মানসে এ জিনিস যেন প্রশ্রয় না পায়।

অমার্জনীয় আলোকসজ্জা

তামসিকতা চর্চার আর একটি বড় উৎস হলো দেওয়ালী উৎসব ও কালীপূজা। দেওয়ালীতে অকারণ বাজী পোড়ানোর হিড়িক আর কালীপূজা উপলক্ষে মাত্রাতিরিক্ত আলোর রোশনাইয়ের দ্বারা লোকমনে অহেতুক আড়ম্বরের বিভ্রম সৃষ্টির চেষ্টা প্রত্যেক বৎসর একটা বাৎসরিক কেলেঙ্কারিতে পর্যবসিত হয়েছে। আগের যুগে রাজা বাদশা ও তাঁদের রাণী ও বেগমসাহেবেরা "এক প্রহরের আমোদে" লাখ লাখ টাকা উড়িয়ে দিতেন বলে শুনেছি। এ যে তাকেও ছাড়িয়ে যাওয়া। বিশেষতঃ কালীপূজায় অত্যধিক আলোর জেল্লার সমারোহ ক্ষমার অতীত অপচয়ের পর্যায়ে পড়ে। এই বাবদে যে মারাত্মক অর্থের অপব্যয় হয় তার প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও এর আরও একটি দিক আছে যা বিশেষভাবে ভাববার। কলকাতা শহরে ও অন্যত্র এখন প্রচণ্ড লোডশেডিং চলছে। বিদ্যুতের অভাবে আলো বন্ধ, পাখা বন্ধ, আরও কত রকম বিপর্যয়। কখন কোন্ অঞ্চলে আলো বন্ধ হয়ে

গিয়ে গোটা এলাকা অন্ধকারে ঢেকে যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। একদিকে কলকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হয়ে জাতীয় অর্থ-নীতির অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে অন্যদিকে নাগরিকদের গৃহে প্রয়োজনের মুহূর্তে আলো নিভে গিয়ে দুঃসহ অসুবিধার সৃষ্টি করে চলেছে। গৃহস্থের বাড়ী অন্ধকার, এদিকে কালীপূজার মণ্ডপগুলি আলোয় আলোয় ভেসে যাচ্ছে ভাবতে গেলেও মাথা ঠিক রাখা দায়। এই অমার্জনীয় আলোকসজ্জার বেলেল্লাপনা এখুনি স্তব্ধ হওয়া দরকার। আইন করে হলেও এ বিষয়ে কিছু একটা করা প্রয়োজন। আমি পশ্চিমবঙ্গের নয়া বামফ্রন্ট সরকারের কাছে এ সম্পর্কে আর্জি রাখছি। এই criminal waste আর একদিনও চলতে দেওয়া উচিত নয়, কালীপূজাকে ঘিরে আলোর মহোৎসবের এই তামসিক বিলাস কঠোর হস্তে দমিত হওয়া আবশ্যক। আলোকে কেন্দ্র করে এ অন্ধকারের মাতামাতি ছাড়া আর কিছু নয়। অন্ধকার অন্ধকারেই তলিয়ে যাওয়া ভাল।

মস্তানতন্ত্র

পূর্বতন কংগ্রেস সরকার নিজেদের দলীয় স্বার্থে মস্তানতন্ত্রকে পুষতেন। পাড়ায় পাড়ায় বেশীর ভাগ বারোয়ারী কালীপূজা যারা করে, তাদের একটা মোটা ভাগ মস্তানদের মধ্যে থেকে এসেছে। সেই মস্তান, যারা বড় বড় চুল ও জুলপি রাখে, হাতে বালা পরে, গায়ে চকড়া বকড়া জামা চাপায়, কোমরে মোটা চামড়ার বেল্ট আঁটা, পায়ে গরমকালেও গামবুটের সদর্প দাপাদাপি। ... এই শ্রেণীর যুবকদের সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার সহজে ঘাঁটাতে সাহস পেত না, কারণ এঁদের দৌলতেই মুখ্যতঃ বাহাত্তরের নির্বাচনে নানা রকম বাহাত্তুরে কাণ্ড ঘটিয়ে কংগ্রেস এ রাজ্যের শাসন ক্ষমতা দখল করেছিল। কাজেই এরা যদি বারোয়ারী কালীপূজায় লাখ লাখ টাকারও বিদ্যুৎ পোড়ায়, বিদ্যুৎ পুড়িয়ে গৃহস্থের বাড়ী অন্ধকার করে রাখে,

সাধ্যি ছিল না সিদ্ধার্থশঙ্করের তাদের গায়ে হাত দেবার। তাহলে যে তাঁরই গদী টলমল করে উঠতো। এক্ষেত্রে কলকাতা ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর ভূমিকা বড়ই করুণ, বড়ই অসহায়। তাদের মস্তানদের হাতের কিল খেয়ে কিল চুরি করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। মস্তানরা চটলে বাবু চটে, বাবু চটলে পশ্চিমবাংলার বুকের উপর বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবসা করাই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

এখন তো জনগণের সরকার গদীয়ান হয়েছেন এখনও যদি আমাদের কালীপূজার কালে পূর্ব পূর্ব বৎসরের মত আলোর প্রহসন দেখতে হয় সে বড় বিসদৃশ ব্যাপার হবে দেখতে। মস্তানীতন্ত্রের আতিশয্যা শুধু নয়, খোদ্ মস্তানীতন্ত্র অতীতের বস্তুতে পরিণত হোক, এইটেই আমরা দেখতে চাই।

॥ ক্যাবারে নাচ ॥

আর এক উৎপাত পাবলিক থিয়েটারগুলিতে ক্যাবারে নাচের দৌরাত্ম্য। চৌরঙ্গীপাড়ার নামী-দামী হোটেল ও রেষ্টুরেন্টগুলিতে বিদেশী ট্যুরিষ্ট ও এদেশীয় আমোদ-সন্ধানীদের মনোরঞ্জনের জন্য ক্যাবারে নৃত্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকে তার একটা মানে বোঝা যায় (যদিও নীতিগতভাবে এই ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য নয়) কিন্তু বাঙ্গালী পাড়ার অভ্যন্তরে মধ্যকলকাতার মঞ্চগুলিতে দর্শকদের প্রলুব্ধ করবার উদ্দেশ্যে ক্যাবারে নাচের আবরণে অনাবরণ নৃত্য দেখাবার কি কোন মানে হয়? অথচ এই অলজ্জ প্রক্রিয়া দিনের পর দিন কোন রকম প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করেই প্রতিকারহীন ভাবে ঘটে চলেছে কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চগুলিতে। এ প্রসঙ্গে 'বারবধূ' নাটকটির নাম বিশেষ ভাবেই করা চলে। এটি এমন এক নাটক, যাকে 'ব্লো-হট' নাটকরূপে বিজ্ঞাপিত করা হয় এবং যাতে জানিয়ে শুনিয়েই নগ্ননৃত্য পরিবেশন করা হয়। জনমত এর জন্য সঙ্গত ভাবেই বিক্ষুব্ধ।

অবশ্য যে-রচনাটিকে অবলম্বন করে এই নাটকটি মঞ্চায়িত হয়েছে—সুবোধ ঘোষের 'বারবধূ'—সেটি একটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প। সাহিত্য-গুণে বিশেষরূপে সমৃদ্ধ। কিন্তু তার নাট্যরূপায়ণে বক্স-অফিসের দিকে লক্ষ্য রেখে ইচ্ছাকৃতভাবে গল্পের বিষয়বস্তুকে বিকৃত করা হয়েছে। মুদ্রিত অক্ষরকে দৃশ্য আর্টে রূপান্তরিত করবার কালে প্রভূত সংযম প্রয়োগের প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় এই নাটকে সেই প্রয়োজন জেনেশুনে লঙ্ঘন করা হয়েছে। কাজেই জনমতের চাপে পড়ে 'বারবধূ'র মত ঘৃণ্যকারজনক নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ হলে একটা সত্যিকারের কাজের মত কাজ হবে।

অপসংস্কৃতির একদিক

আমাদের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের আসরে এমন অনেক পত্র-পত্রিকা আছে যেগুলির পরিচালক সম্পাদকেরা মুখে প্রভূত রবীন্দ্র-ভক্তি কবুল করেন অথচ কার্যতঃ অপসংস্কৃতির পোষকতা করেন। একটি বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকাকে এ ব্যাপারে প্রধান আসামীর কাঠগড়ায় ফেলা যায়। আমাদের মতে কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির অভিব্যক্তির সঙ্গে অপসংস্কৃতির সমর্থন একেবারেই খাপ খায় না। এই দুইয়ের মধ্যে এতটাই অসামঞ্জস্য যে, তেলে জলে মিশ না খাওয়ার মত উভয়ের মধ্যে স্বতঃ-বিরোধের সম্পর্ক বর্তমান। অপসংস্কৃতি বলতে রুচির বিকার, যৌনতা, অন্ধকার প্রবৃত্তির পোষকতা, সমাজবিরোধী চিন্তার দাস্যতা, ইত্যাদি নানা প্রকারের মালিন্যকে বোঝায়। রবীন্দ্রাদর্শের সঙ্গে এইসব অপলক্ষণগুলির দূরতম কল্পনাতেও মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা আলো আর অন্ধকারের এককালীন সহাবস্থান সম্ভব নয়। একই নিঃশ্বাসে যেমন গরম বাতাস ও ঠাণ্ডা বাতাস বওয়ানো যায় না, তেমনি একই সঙ্গে রবীন্দ্র-সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির পোষকতা করা যায় না। বর্তুলাকার গর্তে যেমন চৌকো কসিকে ঢোকানো কঠিন, তেমনি রবীন্দ্র-সংস্কৃতির কাঠামোয় অপসংস্কৃতিকে গ্রথিত করা অসম্ভব। একটিতে আরেকটির নাস্তিত্ব বোঝায়, একটিকে স্বীকার করলে আরেকটির অস্বীকৃতি স্বতই প্রতিপাদিত হয়ে পড়ে।

অথচ আমাদের সাহিত্যের কিছু কিছু লেখক এমন ভাব দেখান যে, তাঁরা যুগপৎ রবীন্দ্র সাহিত্যের ভক্ত এবং শিল্পীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে বর্তমান সাহিত্যে যে Permissiveness-এর আগাছার চাষ চলছে তার বিশেষ অনুগামী। এক শ্রেণীর লেখক স্বাধীনতা বা কলাকৈবল্যবাদী নীতির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত অনুরক্তিবশতঃ সাহিত্যে

কী ধরনের স্বেচ্ছাচার করে চলেছেন তার কথা সকলেই জানেন। এঁরা এঁদের লেখার ভিতর যৌনতার তথা অশালীনতার হুল্লা করে ছাড়ছেন। নর-নারীর মিলন-দৃশ্য বর্ণনার ছল করে এঁরা চূড়ান্ত রকমের উচ্ছৃঙ্খলতার রজ্জুতে আল্‌গা দিয়ে চলেছেন। দেহবাদী বর্ণনার সুযোগ পেলে এঁদের কলম যেন বাগ মানতে চায় না, বল্গাহীন প্রমত্ত ঘোড়ার মতো দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলাই এঁদের লেখনীর মজ্জাগত অভ্যাস।

যার যেমন রুচি সে তেমন আচরণ করে। দেহবাদী লেখকদের অশ্লীলতার প্রতি আকর্ষণ তাঁদের স্বভাবেরই অনুযায়ী ব্যাপার। সুতরাং তাঁদের এই আচরণে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এঁরাই যখন একই মুখে রবীন্দ্র-সংস্কৃতি ও রবীন্দ্র-জীবনাদর্শের প্রশস্তি কীর্তন করেন তখন হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারিনে। আমাদের সাময়িক পত্র-পত্রিকার আসরে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে, অপসংস্কৃতির প্রচারে ও প্রসারে যেটির রেকর্ড সবচেয়ে নিন্দনীয়, অথচ কাগজটির রবীন্দ্র-ভক্তির আতিশয্য দেখলে বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। একই কালে অপসংস্কৃতির পোষকতা ও গদগদ রবীন্দ্র ভক্তির চর্চা কী করে সম্ভব হয় তা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা বুঝতে পারিনে। অনেক মাথা খুঁড়েও আমরা এই দুই বিপরীত বস্তুর একত্র সহাবস্থানের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারিনি।

হয়ত এই অক্ষমতা আমাদেরই স্থূলবুদ্ধির ফল। স্থূলবুদ্ধিতে এই আমরা বুঝি যে আলোর সঙ্গে অন্ধকারকে একত্র মেলানো যায় না। কালোর সঙ্গে ধলো পাশাপাশি খাপ খায় না। তাই যদি হয় তো রবীন্দ্র সংস্কৃতির সঙ্গে অপসংস্কৃতিকে কেমন করে মেলানো সম্ভব? একদিকে রুচির শুভ্রতা, আলোকোজ্জ্বলতা, চিন্তার অনাবিলতা, অন্য-দিকে রুচির মালিন্য, অন্ধকার প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা, বাসনার নিম্নগামিতা— এ দুইয়ের মধ্যে কেমন করে সামঞ্জস্য হয়? জোড় মেলানোর গাজুড়ি প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে কোনো মতেই এই দুইয়ের সমন্বয় করা যায় না।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সুস্থ সংস্কৃতির এক মূর্তিমন্ত বিগ্রহ স্বরূপ। আমাদের চিন্তায় যা কিছু সুন্দর, শুভ্র, বরণীয় ও মহণীয়, রবীন্দ্র সাহিত্য ও কাব্যে তারই প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করি। রবীন্দ্র জীবন তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তার মতোই সমান আলোকোজ্জ্বল। রবীন্দ্র-শিল্পী-ব্যক্তিত্বকে ঘিরে এক চিরভাস্বর গৌরব দীপ্তি বিরাজ করছে। সেই রবীন্দ্রনাথের পুণ্য নামের উচ্চারণের সঙ্গে যখন একই কালে, আমরা, 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'মানুষ' প্রভৃতি রুচিমলিন উপন্যাস পাঠ্যবস্তু হিসাবে পরিবেশিত হতে দেখি, তখন আমাদের বুদ্ধি গুলিয়ে যায়, চিন্তা ঘুলিয়ে ওঠে, স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে বসি এই বিভ্রান্তিকর রহস্যের অর্থ কী আর তার কিনারাই বা কে আমাদের করে দেবে।

সাহিত্য বস্তুটি বাস্তবতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হলেও বাস্তবতার উপস্থাপন মাত্রেই সাহিত্যে গ্রাহ্য নয়। বাস্তবতার উপস্থাপনায় সুনির্বাচনেরও একটা মস্ত ভূমিকা আছে অর্থাৎ সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনপন্থী হওয়া দরকার। যা জীবনে ঘটে তাকেই অবিকৃত রূপে সাহিত্যে পরিবেশন করা চলে না। এক্ষেত্রে ঝাড়াই বাছাইয়ের একটা ভূমিকা আছে। ঝাড়াই-বাছাইয়ের পর যাকে পরিবেশন করা হচ্ছে, তাকে সাহিত্যসম্মত ভাবে পরিবেশন করতে হয় অর্থাৎ অনেক কাট-ছাঁট, অনেক গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবকে উপস্থিত করা রীতি। সাহিত্য বাস্তবের ফটোগ্রাফী নয়। বাস্তব কথাটার অর্থ স্থূল বস্তুগত, বস্তুনিষ্ঠ। তার মধ্যে সত্যের ব্যঞ্জনাও নিহিত রয়েছে। বাস্তব বললেই সত্য বস্তু বা সত্য ঘটনার ইঙ্গিত মেলে। কিন্তু কথা-সাহিত্যে, কাব্যে বা নাটকে বা অন্য কোন শিল্প মাধ্যমে এই সত্যকে যখন পরিবেশন করবার প্রয়োজন হয় তখন তাকে সুন্দর ভাবে পরিবেশন করাও সমান জরুরি হয়ে পড়ে, নয়তো শিল্পের মর্যাদা থাকে না। সাহিত্যের অনুষঙ্গে সত্যের মানেই হলো সত্য ও সুন্দরের সমন্বিত রূপ। যা সুন্দর নয়, রুচিশোভন নয়, পরিমিতি বোধ যুক্ত নয়, তা সত্য হলেও সাহিত্যে পরিত্যাজ্য। নির্বিচার সত্যের উপস্থাপন

সাহিত্যের কাজ নয়, অন্য কোন মাধ্যমের কাজ হলেও হতে পারে—আর যেহেতু সাহিত্যে সত্যের ধারণা সুন্দরের সঙ্গে জড়িত, সেই কারণে তা একই সঙ্গে কল্যাণের সঙ্গে জড়িত। কল্যাণ অর্থে সমাজ কল্যাণ। যা সমাজ কল্যাণের পরিপোষক নয়, তেমন জিনিস সত্য ভিত্তিক হলেও সাহিত্যে বা শিল্পে গ্রাহ্য নয়। শিল্প ও সাহিত্যে সত্য-শিব-সুন্দরের যে-আদর্শের কথা আমরা শুনে থাকি তার সারবত্তা এই জন্য। সত্যকে বাদ দিয়ে সুন্দর নয়, সুন্দরকে বাদ দিয়ে সত্য নয়। আর সত্য ও সুন্দরের একই সঙ্গে কল্যাণধৃতও হওয়া চাই। আর এই ত্রয়ী আদর্শের এককালীন সার্থকতাই সাহিত্যের মর্মবস্তু।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সত্য, শিব ও সুন্দরের মধ্যে এই অভিন্ন যোগ-সূত্রের তত্ত্ব জানতেন ও তাকে মানতেন। তাঁর কাব্য সত্য, শিব ও সুন্দরের অচ্ছেদ্যতার, এক বিগ্রহ স্বরূপ। আর শুধু রবীন্দ্রনাথের কথাই বা বলি কেন, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, নজরুল, যাঁরাই বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে স্থায়ী কীর্তি অর্জন করে গেছেন এবং জনগণের হৃদয়াসনে চিরসম্মানের গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই বাস্তবের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের অভিজ্ঞতায় বাস্তবের সুশ্রী ও কুশ্রী, উজ্জ্বল ও মলিন—এই দুই রূপেরই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। জীবনের পথে চলতে গিয়ে তাঁরা অমৃতের সঙ্গে অনেক বিষও পান করেছিলেন, পান করতে তাঁদের হয়েছিল! কিন্তু যখন তাঁরা সাহিত্যের জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন, তাঁরা শুধু দেশবাসীকে অমৃতই বিলিয়েছেন, জীবনের মালিন্যময় মূর্তিটিকে লোকচক্ষে প্রকট করার তাগিদ বোধ করেননি। সেটা লোক-কল্যাণকর হতো না বলেই সে কাজ থেকে তাঁরা প্রতিনিবৃত্ত থেকে-ছেন।

অর্থাৎ একান্তরূপে তাঁরা গ্রহণ-বর্জন-নির্বাচনপন্থী ছিলেন। বিশেষ করে এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার তুলনা হয় না। তাঁকে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের জীবন্ত প্রতিমূর্তি বললেও চলে। সুস্থ সংস্কৃতির

তিনি এক মহোজ্জ্বল বিগ্রহ। সেই রবীন্দ্রনাথের পুণ্য নামকে টেনে এনে যখন অতিবাস্তববাদীর দল জীবনের সত্যকে নির্বিচারে ও অকুণ্ঠ ভাবে পরিবেশনের প্রক্রিয়ায় মাতেন তখন সেটা শিল্পের ব্যভিচারে পরিণত হয়। কোন রকম বাধা-বন্ধন না মেনে সত্যকে তদ্বৎ ভাবে অর্থাৎ তার স্ব-স্বরূপে প্রকাশ করতে গেলে সেটা আর সাহিত্য থাকে না, ফোটোগ্রাফীর কোঠায় গিয়ে পড়ে। তার সঙ্গে যদি আবার মালিন্য তথা উদ্দেশ্যের অসততা যুক্ত হয় তাহলে সেই নিম্নগামী প্রবৃত্তির কলুষ স্পর্শে ফোটোগ্রাফী ফোটোগ্রাফীও আর থাকে না। সেটা পর্ণো-গ্রাফীর অন্ধকারকুঠরীতে গিয়ে জায়গা নেয়। লেখনী প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাস্তব সত্যের সঙ্গে অসৎ উদ্দেশ্য সংযুক্ত হলে সাহিত্য পর্ণোগ্রাফীর শ্রেণীতে অবনীত হয়।

আমাদের দেশের 'বিবরবাদী' লেখক সম্পাদকের দল এ জিনিসটা বুঝতে চান না। তাঁরা বাস্তবতা পরিবেশনের নামে অতি নোংরা বস্তুকেও সাহিত্যের উপজীব্য করতে ছাড়েন না। কিন্তু এটা তাঁদের খেয়াল হয় না যে কুৎসিৎ বাসনা-কামনার প্রকাশ জীবনের সত্য হলেও তা সাহিত্যের সত্য নয়। জীবনে অনেক ধিক্কারযোগ্য, নিন্দা-মন্দের জিনিসই ঘটে। তা বলে তাকে যেমনটি ঘটেছে তেমনি ভাবে সাহিত্যে উপস্থিত করার অধিকার কারও নেই। এমন বস্তু সাহিত্যের পাতে দিতে নেই যা পাঠকের প্রবৃত্তিকে নিম্নাভিমুখী করে, তার চিন্তাকে সুস্থতার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। এক কথায় তাকে বিবরমুখী করে।

আমাদের 'বিবরবাদী' লেখকেরা ঠিক এই জিনিসই করছেন। তাঁদের আদর্শ এমনিতেই যথেষ্ট ভর্ৎসনাযোগ্য, তার উপরে তাঁরা যখন রবীন্দ্রনাথের দোহাই পাড়েন তখন তাঁদের আচরণের কিম্ভুতত্বে তাজ্জব বনে যেতে হয়। একই সঙ্গে তামাকও খাব, দুধও খাব—এ জিনিস হয় না। অশ্লীলতার বেসাতি করতে হলে প্রাণ খুলে অশ্লীল-তার বেসাতি করো, কিন্তু দোহাই, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পুণ্যনামকে জড়াতে যেয়ো না। সেটা নিজেকে প্রবঞ্চনা, অন্য দশজনকেও

প্রবঞ্চনা। যারা সমাজকল্যাণের ধার না ধেরে, জনসাধারণের মনোভাবের তোয়াক্কা না করে, চুটিয়ে অপসংস্কৃতির চর্চা করছেন তাঁরা যেন রবীন্দ্র-ভক্তির তিলক ছাপ অঙ্গে না ধারণ করতে যান। কপট বৈষ্ণবের ভাণের মতো এটা চূড়ান্ত রকমের মিথ্যাচার। এই ফাঁকি ও মেকীর কারবারের অশুভ স্পর্শ থেকে সৎ পাঠক দূরে থাকবেন এইটেই আমাদের প্রত্যাশা।

অপসংস্কৃতি ও বিজাতীয়তা

আমাদের সাহিত্যে নাট্যে সঙ্গীতে চলচ্চিত্রে অপসংস্কৃতির যে প্রাতুর্ভাব দেখতে পাওয়া যায় তার মূল প্রেরণা বিজাতীয় দৃষ্টান্ত। বিজাতীয় মনোভাবের প্রভাবে অনেক দিন থেকেই আমাদের দেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা একটা অস্বাভাবিক ধারা বেয়ে অগ্রসর হয়ে আসছিল। স্বাধীন হওয়ার পরেও সেই অগ্রগতি রুদ্ধ হয়নি, বরং বিশেষ অবস্থা ও ঘটনার চক্রে জাতীয় জীবনে অপসংস্কৃতির প্রভাব আরও যেন বেড়ে গিয়েছে বলে মনে হয়।

বিজাতীয় দৃষ্টান্তগুলি সাধারণতঃ পশ্চিম ইউরোপের দেশ সমূহের সূত্রে এসেছে। যেমন—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, স্পেন, পর্তুগাল, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি। এর সঙ্গে অতলান্ত সাগর পারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও নাম-তালিকায় যুক্ত করতে হবে, কারণ মার্কিনী সংস্কৃতি পশ্চিম ইউরোপের সংস্কৃতিরই সম্মিলিত রূপ ভিন্ন আর কিছু নয়, এবং এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপ থেকেও এককাঠি সরেস। পশ্চিম ইউরোপেরই বিভিন্ন দেশ থেকে লোক একদা দলে দলে গিয়ে আমেরিকায় বসতি স্থাপন করেছিল এবং সে দেশের সংস্কৃতির অবয়ব গড়ে তুলেছিল। মূল ধর্মাবলম্বী থেকে ধর্মান্তরিতের উৎসাহ যেমন বেশী হয়, তেমনি মূল সংস্কৃতি অপেক্ষা মূল সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত দত্তক সংস্কৃতির উগ্রতা হয় বেশী। মার্কিনী সংস্কৃতি সম্পর্কেও সেই কথা। সারা জগৎ জুড়ে এই সংস্কৃতি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ছদ্মবেশে চূড়ান্ত রকমের স্বেচ্ছাচার ছড়াবার জন্য দায়ী। অপসংস্কৃতির একটা প্রধান উৎসই হলো সংস্কৃতি চর্চার নামে মার্কিন সমাজের উৎকট permissiveness বা নৈরাজ্য।

দীর্ঘ দুশো বছরেরও বেশী বিজাতীয় শাসনের পায়ের তলায় থাকার ফলে আমাদের সংস্কৃতি তার জাতীয় প্রতিভা অনুযায়ী বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি, শুরু থেকেই তার উপর অনুকরণাত্মক সংস্কৃতির অস্বাভাবিক ছাপ এসে পড়েছিল বিলক্ষণ মাত্রায়। প্রথমে ইংরেজের কালচারের দৃষ্টান্তে এই অনুকরণ ঘটেছিল, তারপর তার সম্পর্কসূত্র ধরে ফরাসী জার্মান স্পেনীয় স্ক্যাণ্ডিনেভীয় এবং সর্বশেষে মার্কিন প্রভাব আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের উপর জাঁকিয়ে বসেছিল বিসদৃশভাবে। দেশ স্বাধীন হয়েছে চৌত্রিশ বছরেরও উপর হলো কিন্তু এই অনুকরণ বা অনুকরণের প্রক্রিয়া আজও স্তব্ধ হয়নি বরং উত্তরোত্তর বর্ধমান, এরূপ মনে করাই সঙ্গত।

ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতা থেকে আমাদের কিছুই উপকার হয়নি এ-কথা নিশ্চয়ই আমার বলা অভিপ্রায় নয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ধারণা কিংবা শিল্পে সাহিত্যে সাহসিক নতুন কিছু করার প্রেরণা যে আমরা মুখ্যতঃ পাশ্চাত্ত্য সূত্রেই আহরণ করেছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষি আর গা শোঁকাশুঁকির ফলে উপকার যেমন হয়েছে অপকারও বড় কম হয়নি। আমাদের সংস্কৃতি ও শিল্পের উপর বিজাতীয় মনোবৃত্তির ছাপ এমন মার্কা-মারা ভাবে মুদ্রিত হয়ে গেছে যে আজ শত চেষ্টা করলেও তার কলঙ্ক লাঞ্ছন মুছে ফেলা আমাদের সাধ্য নয়। একটা অভিশাপের মত এই বিজাতীয়তার বাস্তু আমাদের আজও তাড়া করে ফিরছে এবং আমাদের দিয়ে যা নয়-তাই করিয়ে বেড়াচ্ছে। এই বাবদে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কত যে অনর্থ জমা হয়ে উঠেছে তার ইয়ত্তা নেই।

আমরা বাংলা সাহিত্যের কারবারী, তাই বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গ মনে রেখেই দুটো একটা কথা বলি। বিজাতীয় ধারণা যে কীভাবে সাহিত্যের ক্ষতি করে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। বিগত শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে প্রধান যে-শিল্পতত্ত্বের প্রচার হয়েছিল তার নাম 'আর্ট ফর আর্টস সেক'। অর্থাৎ শিল্পের

জন্যই শিল্প, বিশুদ্ধ শিল্পের অন্বেষণ ছাড়া শিল্পচর্চার আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। মার্জিত বাংলায় এরই নাম দেওয়া হয়েছে কলাকৈবল্যবাদ। এই তত্ত্ব আমাদের সাহিত্যের প্রভূত ক্ষতি করেছে। প্রধানতঃ ইংরেজী এবং ফরাসী শিল্প-সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত প্রভাবেই এই তত্ত্ব আমাদের সাহিত্যিকদের মনে মোহ বিস্তার করেছিল, পরে অন্যান্য দেশের শিল্প-সংস্কৃতির প্রভাবও তার সঙ্গে যুক্ত হয়। ফরাসী প্রভাবই এই খাতে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কী কুক্ষণে আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের একটা বড় অংশের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে সমাজের কাছে শিল্পের কোন দায় নেই, শিল্পীর শিল্পচর্চা করার অধিকার নিরঙ্কুশ, সে তার শিল্প-মাধ্যমকে নিয়ে যা-ইচ্ছা তা করতে পারে, যে-কোন উদ্দেশ্যে তার ব্যবহার করতে পারে, তাতে সমাজের ভাল হলো কি মন্দ হলো সে দেখার গরজ তাঁর নয়। শিল্পসৃষ্টি সমাজকল্যাণ-নিরপেক্ষ পুরাপুরি ব্যক্তিভিত্তিক একটা ব্যাপার।

বলাই বাহুল্য যে, এটা একটা ভুল ধারণা। কিন্তু হলে হবে কি, দীর্ঘকাল এই ধারণা আমাদের লেখকদের একটা মোটা ভাগের মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে ছিল এবং তার রন্ধ্রপথে বহু অনিষ্টের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল বাংলার সাহিত্যে ও সমাজে। আজও এই অপপ্রভাব কেটে যায়নি বরং সন্ত্রস্ত হয়ে লক্ষ্য করছি ওই ভ্রমাত্মক মতবাদের পশ্চাৎটান এখনও আমাদের অনেক লেখককে বিপথগামী করে ভ্রষ্টাচারে নিমজ্জিত করে রেখেছে। অভিযোগটা যে কথার কথা নয়, বাজারী পত্র-পত্রিকার পরিবেশিত একশ্রেণীর লেখকের রচনার ধাঁচ-ধরণ অনুধাবন করলেই সেটা বিলক্ষণ মালুম হবে।

আর্ট'স ফর আর্টস সেক তত্ত্ব একটা বস্তা পচা পুরনো মত। সেটা কবেই বাসী হয়ে গেছে। তার পর প্রায় একশো বছর গত হতে চললো, ইতোমধ্যে টেমস আর সীন নদী দিয়ে কত যে জল গড়িয়ে গেছে তার কোন লেখাজোখা নেই, অথচ আমাদের গঙ্গা-পারের এক শ্রেণীর লেখক আজও মোহঘোরে পুরাতনের জাবর কেটে

চলেছেন তো চলেছেনই, তাঁদের আর সম্বিৎ ফিরে আসছে না। লেখকের তথাকথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর চিন্তার স্বাধীনতার অজুহাতে এঁরা চূড়ান্ত রকমের স্বেচ্ছাচারের রাশে আলগা দিয়ে ভাবেন এঁরা প্রগতির চর্চা করছেন, অগ্রসর ভাবনা-ধারণার পোষকতা করছেন; কিন্তু আসলে যা করছেন তা হলো এক দুর্গন্ধ-ছড়ানো বাতিল মতবাদের অঞ্চল-সংলগ্ন হয়ে থেকে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে জোরদার করে চলা—সৌন্দর্যসৃষ্টির নামে অশ্লীল ও অশালীনকে মদদ জোগানো। এঁদের নান্দনিকতার আত্মপ্রসাদ প্রকৃতপক্ষে আত্মবঞ্চনা মাত্র; সমাজ বিচ্ছিন্ন অসার আত্মকেন্দ্রিকতার লীলাবিলাস ভিন্ন এ জিনিস আর কিছু নয়।

শিল্পের জন্য শিল্প তত্ত্বে শিল্পকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়, এমন একখানা ভাব করা হয় যেন শিল্প জীবনের চেয়েও বড়। কিন্তু কার্যতঃ শিল্প জীবনের একটি অংশ মাত্র। জীবনের সঙ্গে শিল্পের বিরোধের ক্ষেত্রে শিল্পকে অবশ্যই জীবনকে স্থান ছেড়ে দিয়ে গৌণ ভূমিকা মেনে নিতে হবে। সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের দাবিকে খাট করে কোন সময়েই শিল্পের দাবি বড় হওয়া উচিত নয়। সমষ্টির স্থান সর্বদাই ব্যক্তির উপরে।

পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাবে আরও একটি মারাত্মক ধারণা এ দেশের শিল্পী সাহিত্যিকদের একাংশের ভিতর শিকড় গেড়ে বসেছে। সেটা হলো উৎকেন্দ্রিক জীবনাচরণের মোহ। শিল্পী হলেই মদ খেতে হবে, বেলেল্লাপনা করে রাস্তায় গড়াগড়ি যেতে হবে, আরও আনুষঙ্গিক নানা রকমের কদাচারে মেতে উঠতে হবে—এই একান্ত প্রমাদপূর্ণ বিশ্বাস আধুনিক বাঙ্গালী লেখকদের সমাজে প্রচলিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত ক্ষতি করেছে। ভারতী আর কল্লোল পত্রিকার সময় থেকে এই বিশ্বাসের শুরু, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে কোথায় এই বিশ্বাস ক্রমশঃ চিড় খাবে, তা নয়, তার প্রাবল্য যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। প্রধানতঃ ফরাসী দেশের শিল্পী-সমাজের দৃষ্টান্ত থেকে এই অপপ্রভাব আমাদের দেশে এসে পৌঁচেছে,

প্যারিসের বোহেমীয় শিল্পীদের জীবনযাত্রার অনুকরণে আমাদের দেশের শিল্পীদের একাংশও সেই ধাঁচে নিজেদের জীবনরীতি গড়ে তুলতে চাইছেন এবং এই পথে উৎকেন্দ্রিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা আর উচ্চণ্ড-তার হদ্দ করে ছাড়া হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ বিজাতীয় একটা আদর্শ, এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর এক আদর্শ, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

শিল্পী হতে গেলেই তাকে নেশা-ভাঙে আসক্ত হতে হবে, অস্থান-কুস্থানে যেতে হবে—এ কেমন কথা? শিল্প একটা পবিত্র ব্রত, একটা কঠিন কর্ম, জীবনের সমগ্র অভিনিবেশ ও উদ্যম এই কর্মে নিয়োগ করলে তবে তাতে সাফল্য লাভ সম্ভব। এই কাজে নিযুক্ত থেকে কি জীবনকে হেলাফেলা করে উড়িয়ে-পুড়িয়ে ছত্রখান করে, নষ্ট করে দেওয়া যায়? যে-কাজে জীবনের তাবৎ প্রাণশক্তি সংহত হওয়া দরকার, গোটা মনোযোগ একত্রীভূত হওয়া আবশ্যক, সে-কাজের পরিকল্পনার মধ্যে কি উদ্দেশ্যহীন অপচয়ের কোন অবকাশ আছে? যে-ফরাসী শিল্প সাহিত্য বোহেমীয় ধ্যান-ধারণা প্রচারের জন্য মূলত দায়ী, সেই সাহিত্যেরই একজন অগ্রগণ্য লেখক ফ্লবেয়ার বলেছিলেন যে, শিল্পীকে শিল্পী হতে হলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, অনেক আমোদ-প্রমোদের মায়া কাটাতে হয়, অনেক ছোটখাট আনন্দ থেকে নিজেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করতে হয়। শিল্প একটা ধ্যান, এ কাজে অসার বিনোদনের কোন জায়গা নেই। ফ্লবেয়ার তাঁর শিষ্য মোপাসাঁকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন। মোপাসাঁ অবশ্য এই উপদেশ অনুযায়ী চলেননি। কিন্তু তার ফল মোপাসাঁর জীবনে মোটেই ভাল হয়নি। গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করে উৎকেন্দ্রিকতার পথে চলতে গিয়ে ছোটগল্পের রাজা মোপাসাঁ স্বীয় জীবনে কী দুর্বিষহ অভিশাপ ডেকে এনেছিলেন তার ইতিহাস মোপাসাঁর জীবনী পাঠক মাত্রেই জানেন।

আসলে শিল্প সংস্কৃতির সম্পর্কে ভুল ধারণা থেকেই শিল্পীর জীবনাদর্শ সম্পর্কিত এই ভ্রমাত্মক ধারণার উদ্ভব। মহৎ শিল্পীরা এইভাবে কখনও নিজের জীবনকে ক্ষয় করেন না, তাঁরা তাঁদের তাবৎ

শক্তি শিল্পসাধনার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করেন। এ কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য বেশী দূরে যাবার দরকার নেই, হাতের কাছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তই তার সবচেয়ে বড় নিদর্শন। সংযম ও ধৃতি-শক্তির তিনি এক মূর্ত প্রতীক। আত্মস্থতার এক মহোজ্জ্বল বিগ্রহ। আমাদের কাব্য সাহিত্যের আরেকজন দিক্‌পাল মাইকেল মধুসূদন, এই নিয়মের বিপরীতে বিজাতীয় উদাহরণের কুমন্ত্রণায় ভুলে নিজের অমূল্য জীবনের বাতিকে একই সঙ্গে দুই ধারে পোড়াতে গিয়ে শেষ বয়সে আপনার ও আপনার পরিবারের মানুষগুলির জীবনে কী সর্বনাশা বিপর্যয় ডেকে এনেছিলেন সকলেরই সে বেদনাদায়ক ইতিহাস জানা আছে, কাজেই এখানে আর তার পুনরাবৃত্তির আবশ্যকতা দেখি না। মধুসূদনের আত্মবিলাপ কবিতাটি অনুতাপের পবিত্র অশ্রুতে বিধৌত এক মহৎ কবির ততোধিক মহত্তর আত্মদোষ-স্বীকার মূলক জবানবন্দী।

আমি প্রবন্ধের গোড়ায় মার্কিনী অপপ্রচারের উল্লেখ করেছি। এই অপপ্রচারের সূত্র ধরেই আমাদের দেশে সাম্প্রতিক সাহিত্যে ও নাটকে যত রাজ্যের জঞ্জাল এসে জমা হতে শুরু করেছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই যে বর্তমানে নানা রকমের দৌরাত্ম্য দেখা দিয়েছে—হিপি ও বীটনিকদের অনুকরণে এদেশীয় হিপি ও বীটনিকদের উৎপাত, রাগী ছোকরাদের নর্তন-কুর্দন, টুইস্ট নাচ, রক অ্যাণ্ড রোল ও পপ গানের মাত্রাতিরিক্ত হুল্লোড়, আমেরিকান টেক্সাস কাউ-বয়দের ধরনে পশ্চিম বাংলার মস্তানদের চকরা-বকরা পোশাক, লম্বা চুল ও জুলফি ও আরও নানা প্রকার আনুষঙ্গিক সজ্জা-বিকৃতি, ক্যাসিনোর জুয়া-খেলার ধরনে যত্রতত্র সাট্টার আড্ডা ও বিবিধ প্রকার মাদকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, প্যারিসীয় ও মার্কিন নাইট ক্লাবের রীতি-পদ্ধতির অনুকরণে এখানকার হোটেলগুলিতে, এমনকি যাত্রা ও থিয়েটারের পালায় ক্যাবারে নাচের অনুপ্রবেশ, মার্কিনী সিনেমা ও টেলিভিশনের দেখাদেখি এখানেও সিনেমা ও টি ভি-তে যৌনতা ও হিংস্রতার ঢালাও আমদানি এবং ছেলেমেয়েদের অপরাধ শেখবার সুযোগ করে দেওয়া

—এ সবই ঘটছে মুখ্যতঃ মার্কিনী দৃষ্টান্তের অপপ্রচারের বশে। এই সব বিজাতীয় সাংস্কৃতিক অভ্যাস—যা আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীদের জীবনে নিত্য বিষময় ফল প্রসব করছে—কঠোর হস্তে দমন করা দরকার। সরকারকেও এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় যে-সরকার প্রতিষ্ঠিত—বামফ্রন্ট সরকার—তা জনগণের সরকার, জনকল্যাণমুখী তার সকল কার্যকলাপের লক্ষ্য। সুতরাং এই সরকারকে বিশেষভাবেই অপসংস্কৃতির প্রতিরোধে অগ্রণী হতে হবে।

ভারতের জাতীয় জীবনের অনুষঙ্গে অপসংস্কৃতি আর বিজাতীয়তার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। ও দুটি শব্দ একটি অপরটির বিনিময়ে ব্যবহারযোগ্য প্রতিশব্দ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ, আমাদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপসংস্কৃতির ঘোলাজলের বন্যা প্রবেশ করছে তো করছেই বিজাতীয়তার ভাঙা বাঁধের ফাটলের মধ্য দিয়ে। এই হিসাবে অপসংস্কৃতি আর বিজাতীয়তা সমার্থক। জাতীয় জীবনের সমস্ত স্তর থেকে বিজাতীয়তার কুপ্রভাব দূর করার মানেই হলো সঙ্গে সঙ্গে অপসংস্কৃতির আবর্জনাকেও বিদায় করা। এই দুটি কাজ যুগপৎ সমাধা করে জাতীয় জীবনকে সর্বপ্রকার জঞ্জাল মুক্ত করা হোক, এই আমাদেব প্রত্যাশা ও দাবি।

চলচ্চিত্রে অপসংস্কৃতি

কিছুকাল হলো কলকাতায় ইংরেজী শিরোনামযুক্ত আপত্তিকর কতকগুলি দক্ষিণ ভারতীয় ছবি পশ্চিম বাংলার বাজার দখল করবার কাজে লেগেছে। এইসব ছবির ভাষা তামিল অথবা তেলেগু অথবা হিন্দী, কিন্তু সেগুলির টাইটেল সর্বদাই ইংরেজী। এই সব ছবির ভাষা তামিল অথচ নামকরণগুলি এই প্রকার—নাইট অব প্যাশন, দি বেদিং বিউটি, দি এরটিক এমব্রেস, দি ট্যান্টালাইজিং মিরার, হিরো অব থাউজেণ্ড বেডস্, ইত্যাদি। নামের মধ্যে লোভনীয় হাতছানি বিস্তারের চেষ্টা স্পষ্ট। ছবির ভাষা দক্ষিণ ভারতীয় কিংবা হিন্দি হলেও, নামগুলি ইংরেজীতে এইজন্য যে, ওই সব চিত্রের চতুর নির্মাতাদের ধারণা, পূর্বাঞ্চলের দর্শকদের কাছে হিন্দী অপেক্ষাও ইংরেজী নামের অন্তর্নিহিত অর্থ বেশী ইঙ্গিতবহ হওয়ার সম্ভাবনা, তাই দেশী ভাষার ছবি হলেও ইংরাজী নামের প্রতিই তাদের পক্ষপাত। নিষিদ্ধ বস্তুর ইঙ্গিত আর সংকেত ফুটিয়ে তুলতে হলিউড মার্কা ইংরেজী নামের তুল্য আপাত-শোভন অথচ আত্যন্ত শয়তানী মনোভাবযুক্ত শিরোনাম আর কী হতে পারে।

ছবিগুলির যেমন নাম, তেমনি বিষয়বস্তু। আগাগোড়া রুচিবিগর্হিত অশালীন দৃশ্যে ঠাসা। ছবির নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঘটনার চিত্রায়ণে ও চরিত্রগুলির পরিকল্পনায় যৌনতার ছড়াছড়ি। কোন কোন দৃশ্য বা সিকোয়েন্স রীতিমত অশ্লীলতার কোঠায় গিয়ে পড়ে। অপসংস্কৃতির চূড়ান্ত। আমরা এতকাল জানতুম, ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে অপসংস্কৃতি ছড়াবার সবচেয়ে অপকৃষ্ট মাধ্যম হলো বোম্বায়ের স্টুডিওতে তৈরি হিন্দীভাষী ছবি। এমন অনেক বোম্বাই মার্কা হিন্দী ছবি আছে যেগুলিতে দর্শকদের নিম্নগামী প্রবৃত্তিকে সুড়সুড়ি দেবার জন্য ইচ্ছাপূর্বক রিরংসাপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা করা

হয়। শুধু তাই নয়, তাদের সুপ্ত হিংসা-প্রবৃত্তিকে চাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে ছবির এখানে-সেখানে অযথা হিংস্র ঘটনাবৃত্তের আমদানি করা হয়। অর্থাৎ, সেক্স আর ভায়োলেন্সের ঢালাও প্রয়োগ।

যুগ্ম অভিযানের লক্ষ্য

যৌনতা ও হিংস্রতার এই এককালীন যুগ্ম অভিযানের একটাই মাত্র লক্ষ্য। তা হলো, দর্শকদের মনকে সুস্থ চিন্তা-ভাবনার প্রভাব-বৃত্ত থেকে সরিয়ে তাকে অন্ধকারের অভিমুখে চালনা করা এবং কালক্রমে এইভাবে তাকে অকেজো করে দেওয়া। দর্শক-সাধারণকে ঘোলাজল খাইয়ে খাইয়ে তাঁদের নির্মলজলের তৃষ্ণাকে একেবারে বিনষ্ট করে ফেলাই এই চক্রান্তমূলক প্রয়াসের আসল উদ্দেশ্য। ভারতীয় বুর্জোয়া শাসক ও বণিক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের সহযোগী ও তাঁদের ইচ্ছা পূরণের যন্ত্রস্বরূপে স্বয়ং নিযুক্ত এই সব হিন্দী সিনেমাওয়ালারা জেনে-শুনে জনগণের রুচিকে বিবরমুখী করে তোলবার কাজে নিযুক্ত। জনসাধারণের সুস্থ জীবনের পিপাসাকে খর্ব, বিশেষ করে তাদের তরুণ ও যুব অংশের সংগ্রামী মনোবৃত্তিকে পরাজিত করতে পারলে আর কী চাওয়ার বাকী থাকে? কায়েমী স্বার্থবাদীদের অর্ধেক যুদ্ধ তো সেখানেই জেতা হয়ে গেল। জনগণকে অবাধে শোষণ করবার অধিকার অব্যাহত রাখতে হলে প্রথমে তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়াই কি সবচেয়ে ফলপ্রদ উপায় নয়?

কিন্তু এখন দেখছি অপসংস্কৃতির কারবারী এইসব সোলে, সঙ্গম, সান, রতি নিবেদন মার্কা হিন্দী ছবিকেও টেক্কা দিয়েছে দক্ষিণ ভারতীয় প্রযোজকদের তোলা পূর্বোক্ত ঘিনঘিনে ছবিগুলি। অপসংস্কৃতির প্রচারে ও প্রসারে হিন্দী ছবির জগতের অসপত্ন আধিপত্য ভোগের ক্ষেত্রে নিদারুণ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিয়েছে তারা। শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, প্রতিস্পর্ধী। ইতোমধ্যেই সেগুলির ব্যাপক জনপ্রিয়তা হিন্দী

চিত্রনির্মাতাদের ভাবিয়ে তুলেছে। কলকাতার বাজার বুঝি হাতছাড়া হয় এমন আশঙ্কায় তারা কাতর।

দক্ষিণ ভারতীয় ছবির দাপটে হিন্দী ছবি কোণঠাসা হওয়ার আশঙ্কা সমূলক বা অমূলক যা-ই হোক, পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকার কিন্তু ভাবিত অন্য কারণে। কি শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে, সরকার অপসংস্কৃতি রোধে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। বিশেষ, চলচ্চিত্রের মত জনসংযোগের এক প্রচণ্ড শক্তিশালী মাধ্যমের মারফত অপসংস্কৃতির বিষ যাতে সমাজদেহে আরও ছড়িয়ে না পড়তে পারে তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার খুবই চিন্তিত। তাঁদের চোখে কি-বা প্রেমকাহিনী (লাভস্টোরী) জাতীয় হিন্দী ছবি আর কি-বা নাইট অব প্যাশন জাতীয় তামিল ছবিতে বিশেষ কোন ভেদাভেদ নেই। পার্থক্য যদি কিছু থেকে থাকে তা হলো পরিমাণের, প্রকাশের নয়। একই অপসংস্কৃতির মুদ্রার সেগুলি এপিঠ আর ওপিঠ। এপিঠের তুলনায় ওপিঠের ছাপ কিছু বেশী ধ্যাবড়া, এই যা তফাৎ।

আইনের অভাব

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এই উভয়বিধ ছবিরই প্রচার কঠোর হস্তে দমনের পক্ষপাতী। কিন্তু উপযুক্ত আইনের অভাবে কিংবা এই জাতীয় ছবি দমনের জন্য যে আইন বর্তমানে চালু রয়েছে, তার ত্রুটির দরুণ তাঁরা কম-বেশি নিরুপায় বোধ করছেন। প্রচলিত আইনের এমন সব ছিদ্র রয়েছে যার ফাঁক-ফোকর গলে অপরাধী স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে যেতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের ছবির বেলায় কী এক দুর্নিরীক্ষ্য কারণে অদ্ভুত রকমের উদার-ভাবাপন্ন বলে মনে হয়। এমন কি, এমন সন্দেহও মনে উদয় হওয়া অসম্ভব নয় যে, এই জাতীয় ছবির প্রচার ও প্রসারে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের গোপন প্রশ্রয় রয়েছে। তাই যদি না হবে তো বারবার বলা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় আইনের সংশোধন হয় না কেন? যখনই

আইন সংশোধনের প্রয়োজনের কথা বলা হয়, তখনই শিল্পের স্বাধীনতার ধূয়া তুলে স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখা হয় কেন ?

আরও এক রহস্যময় ব্যাপার। কেন্দ্রীয় সরকারের যে-ফিল্ম সেন্সর কমিটি রয়েছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন প্রতিনিধি নেই বা রাজ্য সরকারের মনোনীত সদস্যদের সেখানে স্থান নেই। এ বিষয়ে রাজ্যের প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তদানীন্তন জনতা সরকারের তথ্যমন্ত্রী শ্রীআদবানি ও বর্তমান কেন্দ্রীর তথ্যমন্ত্রী বসন্ত শাঠের দৃষ্টি বারংবার আকর্ষণ করা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন প্রতিকার-ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। এ বড় তাজ্জবের কথা যে, এ রাজ্যে প্রদর্শনের জন্য যত রাজ্যের উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় ছবি দেখানো হবে, অথচ সেসব ছবির ভালমন্দ সম্বন্ধে কথা বলার অধিকার এ রাজ্যের অধিবাসীদের নেই। বর্তমান গঠিত কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডে পশ্চিম বাংলার যে দু-একজন সদস্য রয়েছেন তাঁরা কেউ এ রাজ্যের জনগণের স্বীকৃত প্রতিনিধি নন, নেহাৎ ব্যক্তিগত পরিচিতির সূত্রে কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ড আলো করে আছেন। তাঁরা যে কী জাতীয় স্বীকৃত প্রতিনিধি, আর রাজ্যের বাসিন্দাদের প্রতি দায়িত্বশীল, তাঁদের কাজেই তার প্রমাণ। তাঁরা যদি এ রাজ্যের মানুষের প্রতি যথার্থ দায়বদ্ধ হতেন তো, প্রবন্ধের গোড়ায় উল্লিখিত দক্ষিণ ভারতীয় ছবিসমূহ বা তাদের সমধর্মী ছবি এ রাজ্যে কোনমতেই দেখানো হতে পারতো না। তাঁরা তাঁদের দায়-দায়িত্ব খুব চমৎকার পালন করছেন যা-হোক।

আইনের অপ্রতুলতার দরুণ কিংবা কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ড তাঁদের উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্যক পালন করছেন না বলেই মাঝে মাঝে এমন ঘটনা ঘটে, যেগুলির ঔচিত্যে সন্দিহান হয়েও সেগুলিকে সমর্থন জানানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। যেমন, পাঠকদের অবগতির জন্য বলি, কিছুকাল আগে ওরকম একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছে কলকাতার গড়িয়া অঞ্চলে। সেখানকার একটি সিনেমা হলে অপসংস্কৃতির রসে টইটম্বুর একটি দক্ষিণ ভারতীয় ছবি দেখানো হচ্ছিল। যাদবপুর-

টালীগঞ্জ এলাকার সংস্কৃতি সম্মিলনী নামক সুপরিচিত সংস্থার উদ্যোগে গঠিত স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি সুসংহত দল ছবিটির প্রদর্শনীতে বাধা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত সিনেমাগৃহের মালিককে ছবিটির প্রদর্শনী বন্ধ করতে বাধ্য করে। জনতার প্রতিবাদের চেহারা দেখে মালিক পরে আর এই ধরনের ছবি দেখাতে সাহস পায়নি।

আপাতদৃষ্টিতে এ জাতীয় আচরণ জবরদস্তিমূলক কিংবা জনতার স্বহস্তে আইন তুলে নেওয়া ধরনের স্বেচ্ছাচার বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যেখানে বারবার বলেও প্রতিকার হয় না, অথবা অপসংস্কৃতির সম্প্রচারে কেন্দ্রীয় কর্তাদের গোপন মদত রয়েছে বলে সন্দেহ করবার কারণ ঘটে, সেখানে এই শ্রেণীর প্রতিরোধের ঘটনাকে সমর্থন না করেই বা কী করা যায়? আর কিছু না-হোক, জনসাধারণের মধ্যে অপসংস্কৃতির অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে যে একটা চেতনার জাগরণ ঘটেছে সেইটেই কি যথেষ্ট আশাপ্রদ লক্ষণ নয়? ক্ষতিকর ছবির কুফল সর্বসাধারণের ভিতর যাতে না বিস্তৃত হতে পারে তার জন্য প্রকাশ্য জমায়েত বা সংঘবদ্ধভাবে বাধা দেওয়া কি অন্যায়? তবে হাঁ, দেখতে হবে এই বাধাদানের প্রক্রিয়া যেন অসংযত না হয়, আগাগোড়া তা যেন শৃংখলা ও নীতিনিয়ম মেনে চলে। প্রতিবাদ সুশৃঙ্খল ও উত্তেজনারহিত হলে অন্যায়-অত্যাচারের তার চেয়ে প্রতিষেধক আর কিছু হতে পারে না।

কুরুচিকর বিজ্ঞাপন

তবে সরকার কুরুচিকর ছবির প্রদর্শনী বন্ধ করতে পারুন আর না পারুন সরকার একটা বিষয়ে বহুলাংশে সফলকাম হয়েছেন। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে যে সেন্সর (পাবলিসিটি মেটিরিয়াল) কমিটি আছে তাঁদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে এ রাজ্য থেকে আপত্তিকর বিজ্ঞাপনের দৌরাত্ম্য অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে। ওই যেসব ঢাউস-ঢাউস বোর্ড বা হোর্ডিং যা পূর্বে রাস্তার মোড়ে মোড়ে শোভমান দেখা যেত, যাতে দুই ভীষণদর্শন প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী দুই হাতে দুই পিস্তল বা

কাঁটাওয়ালা মুগুর নিয়ে মাঝখানে বিস্রস্তবসনা বা স্বল্পবাসপরিহিতা প্রণয়িনীকে রেখে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গীতে মুখিয়ে রয়েছে কিংবা হাতে মদের গ্লাস নিয়ে কোন বিলোলকটাক্ষিণী অর্ধ-নগ্নিকা ক্যাবারে-বিলাসিনী পানশালায় নৃত্যরতা—এসব ছবির দিন গত হয়েছে। বোম্বাই থেকে লাখ-বেলাখে ছাপা হয়ে এগুলি এ রাজ্যে আসত, এখন এগুলির প্রদর্শন কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। লোকের চোখের সামনে লোভনীয় বস্তুর টোপ ফেলে তাদের প্রলুব্ধ ও মোহগ্রস্ত করবার ভিনদেশী বজ্জাতি আজ আর এখানে কল্কে পাচ্ছে না। প্রতিরোধের ছবির বিজ্ঞাপনে যে অপসংস্কৃতি প্রতিরোধের শুরু, খোদ্ ছবির মধ্যে এখন তা সম্প্রসারিত হোক।

বাংলা গানে অপসংস্কৃতি

আধুনিক বাংলা গানের দেহে ও মনে আজ অপসংস্কৃতির কলি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে বলা যেতে পারে। 'দেহে' অর্থাৎ বাণী অংশে, কথার কাঠামোয়, যে-কাঠামোকে অবলম্বন করে সুর দাঁড়াবার সুযোগ পায়। 'মনে' অর্থাৎ সুরে, যে সুর হলো গানের মূল আশ্রয়। কথা ছাড়াও গান হতে পারে, কিন্তু সুর বিহনে গানের অস্তিত্ব ভাবা যায় না।

কথা এবং সুর এই দুই ক্ষেত্রেই এখন বাংলা গানে পরিপূর্ণ নৈরাজ্য চলছে। এবং এই নৈরাজ্যের আসল কারক অপসংস্কৃতি। অপ-সংস্কৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা রূপ আছে। এইসব কয়টি রূপই অধুনা বাংলা গানের জগতে প্রকট।

কথায় কী জাতীয় অপসংস্কৃতির নোংরামো ছড়ানো হচ্ছে তার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি। গানের কয়েকটি আস্থায়ী তুলে ধরলেই ব্যাপারটা সকলের মালুম হবে। গোটা গান উদ্ধৃত করবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নেই। যেমন, অপবাদ হোক না আরো বয়েই গেল / নয় লোক জানাজানি হয়েই গেল / প্রেম কি তাতেই কমে / বরং আরও বেড়েই গেল। কিংবা, তোমাকে যে ভালবাসি অনেকেরই মত নেই / চুরি করে প্রেম করা ছাড়া পথ নেই। অথবা, প্রেম করা যে কি সমস্যা / আজ পূর্ণিমা কাল অমাবস্যা। কিংবা, এবার মরে সুতো হবো / তাঁতীর ঘরে জন্ম নেব / পাছা পেড়ে শাড়ি হয়ে / ঝুলবো তোমার কোমরে। অথবা, শোন মন বলি তোমায় / সব কোরো প্রেম কোরো না / প্রেম যে কাঁঠালের আটা / লাগলে পড়ে ছাড়ে না। ইত্যাদি।

এই রকমের কথা ও ভাব যুক্ত আরও একাধিক গান আছে কিন্তু তালিকা বাড়াবার প্রয়োজন দেখি না। কী হবে একই ধরনের

কুরুচিকর ইঙ্গিত ও সংকেতপূর্ণ কথার কচালি গানের নমুনার অজুহাতে তুলে ধ'রে আমার লেখাটিকে কলঙ্কিত করে? যে কয়টি উদাহরণ দেখানো হয়েছে তা-ই কি অপসংস্কৃতির সাঙ্গীতিক নিদর্শন হিসাবে যথেষ্ট নয়?

অন্যদিকে সুরে অপসংস্কৃতির নমুনা হলো সুর পরিবেশনের নামে হেঁচকি টান দিয়ে সুরের আবৃত্তি করা, যার মধ্যে সত্যিকার সুরের বিন্দুমাত্র আমেজ খুঁজে পাওয়া যায় না বরং আসুরিক দৌরাত্ম্যের ভাবটাই প্রবল, এবং গানের সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীত সংযোজনের নামে বাজনার অনাবশ্যক কোলাহল সৃষ্টি করা। গানের অনুষঙ্গ হিসাবে গানের সহায়কারী রূপে বিবেচিত এই যন্ত্রসঙ্গীতের কোলাহলের আদর্শ আমরা বাংলা গানে হিন্দি সিনেমার গানের দৃষ্টান্ত থেকে আমদানি করেছি এবং ওই হিন্দি সিনেমার গানগুলিও এসেছে পাশ্চাত্যের রক-এন্-রোল এবং পপ মিউজিকের সুরাদর্শের আদল থেকে। আজকাল গ্রামোফোন রেকর্ডের আধুনিক বাংলা গান নামধেয় গান এতটাই যন্ত্রসঙ্গীতের কোলাহলমুখর হয়ে উঠেছে যে তাকে কোলাহল না বলে চিৎকার বললে সঠিকতর বর্ণনা করাহয়। একদিকে যন্ত্রসঙ্গীতের সম্মিলিত চিৎকার অন্যদিকে গায়কের আবৃত্তিভঙ্গিম সুরে হেঁচকা টান দিয়ে দিয়ে কথার উচ্চারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলা গানকে শ্রুতি-সুখকর একটা বিনোদনের বস্তুতে পরিণত না করে তাকে অত্যাচারের সামিল করে তুলেছে।

বলা হবে শব্দের কোলাহল কিংবা হেঁচকা টানের উচ্চারণের সঙ্গে অপসংস্কৃতির সাক্ষাৎ যোগ কোথায়? আপাতদৃষ্টিতে যোগ নেই ঠিক কিন্তু গূঢ়ার্থে যোগ আছে। যোগ আছে বলছি এইজন্য যে, যা কিছু আমাদের পরিমিতিবোধকে ব্যাহত করে, ছন্দ ও শৃঙ্খলার ধারণাকে আঘাত ক'রে আমাদের সৌন্দর্যচেতনাকে পীড়িত করে, তাই কুরুচির কারক এবং পরিণামে অপসংস্কৃতির সহায়ক। আমাদের স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে যা-কিছু আমাদের মনকে বিকারের পথে চালনা করবার প্রয়াস পায় তা-ই অপসংস্কৃতির কোঠায় পরিগণিত

হবার যোগ্য। সেইদিক থেকে বিচার করে দেখলে গানের রাজ্যে অতিরিক্ত কথা কিংবা সুরের কোলাহল অপসংস্কৃতি নামেই অভিহিত হবার অপেক্ষা রাখে ষোল-আনা। এই জাতীয় কোলাহল মনে একটা কৃত্রিম উল্লাস কিংবা কপট উদ্দীপনের বিভ্রম জাগিয়ে তুলে গীতামোদী জনসাধারণকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিপথে চালিত করে। কাজেই এমনতর সুরসৃষ্টির প্রচেষ্টাকে সর্বদাই কিঞ্চিৎ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা কর্তব্য।

প্রবন্ধের গোড়ায় যে সব গানের পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করেছি সেগুলির সমর্থনে কেউ কেউ এই যুক্তি নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন যে, এর আগেও তো বাংলা ভাষায় অনেক প্রেমসঙ্গীত লেখা হয়েছে, কই, সেগুলির বিরুদ্ধে তো কেউ কখনও কোনরকম উচ্চবাচ্য করেননি? আগের প্রেমের গান সব সমালোচকের ছাড়পত্র পেয়ে গেল, আর এখনকার গানের বেলাতেই যত আপত্তি? এইসব গানের রচয়িতারা সবাই হালফিল কালের মানুষ বলেই কি তাঁদের বিরুদ্ধে এই সোরগোল নয়?

এই অভিযোগের উত্তরে বলি, আগে যাঁরা বাংলায় প্রেমের গান লিখেছেন তাঁরা সকলেই কৃতবিদ্য মানুষ, কবি ও রসের মর্মজ্ঞ, সাহিত্যে রুচি ও কুরুচির সীমারেখা তাঁরা মানতেন, শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থের গভীর ব্যঞ্জনায় তাঁরা বিশ্বাস করতেন এবং সেই অবস্থানে থেকে ব্যঞ্জনাময় শব্দের প্রয়োগে যেমন তাঁরা যত্নশীল ছিলেন তেমনি মন্দ ভাবের উদ্রেককারী শব্দ পরিহারেও সমান মনোযোগী থাকতেন। এঁরা কাব্যে শ্লীল-অশ্লীলের তত্ত্ব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। এঁদের মধ্যে পড়েন রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, কাজী নজরুল ইসলাম, এমনকি পরবর্তীকালের অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায় প্রমুখ আধুনিক গীতিকারগণ। এঁদের সকলেই প্রেমের গান লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রেমের গান তো অজস্র বলা যায়। কিন্তু কোথাও তাঁরা সাহিত্যের স্বীকৃত সীমারেখা লঙ্ঘন করেননি।

. রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের গান অতি উচ্চ ভাবানুভূতির দ্যোতক, সেগুলির রস এতই সূক্ষ্ম ও সুকুমার আবেদনযুক্ত যে, সেগুলিকে দেহজ প্রেমের সঙ্গে সম্পর্কিত রচনা ভাবার বদলে বিদেহী ভাবলোকের মরমী রচনা বললেই যেন তাদের যথার্থতর পরিচয় দেওয়া হয়। ওই যে কবির প্রেমপর্যায়ের গানকে কখনও কখনও পূজাপর্যায়ের গান বলে ভ্রম হয় তার কারণই হলো তাঁর প্রেমের গানের অতি সূক্ষ্ম দ্যোতনা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়েই দেওয়া গেল, তাঁর চেয়ে অনেক, অনেকগুণ বেশি মর্ত্যসংলগ্ন কবি এমন যে কাজী নজরুল, যাঁর সকল ভালবাসার গানই বলতে গেলে রক্তমাংসের মানবীয় প্রেম ও বিরহের বেদীমূলে কামনার ভোগারতি, তিনিও কি কখনও প্রেমের গান লিখতে গিয়ে শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছেন? কখনই নয়।

নজরুল রবীন্দ্রনাথের মত অতীন্দ্রিয় ভাবের কবি না হলেও এবং একান্তভাবে দেহজ প্রেমের বন্দনকারী কবি হলেও, যেহেতু তিনি ছিলেন প্রকৃত কাব্যের এলাকার মানুষ সেই কারণে কাব্যকে বা গানকে অমিতাচারী কল্পনা বা অসংযত ভাবের বাহন করার কথা তাঁর ভুলেও কখনও মনে হয়নি। নজরুলের গজলগুলি ষোল-আনার উপর আঠারো-আনা প্রেমের গান কিন্তু কোথাও এতটুকু বেচাল ভাব নাই, সবটাই কবির আত্ম-আরোপিত নিয়ন্ত্রণ রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ। চেয়ো না সুনয়না আর চেয়ো না এই নয়ন পানে, কিংবা আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী প্রভৃতি গজলবর্গের গান আপাতবিচারে স্থূল চাওয়া-পাওয়ার আকৃতিমূলক গান বলে মনে হলেও সেগুলিতেও একটা অদৃশ্য অথচ অনুভববেদ্য সংযম বন্ধন রয়েছে, যা এখনকার গানে ও রচনায় প্রায় স্থলেই অনুপস্থিত বলা চলে।

নিধুবাবুর গানে পাই ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে,...আমি তোমাবই জানিনে, কিম্বা পীরিতি না জানে সখি সে জন সুখী বল কেমনে—এসব গানের পদ আপাতবিচারে প্রেমের প্রকট প্রকাশ বলে মনে হলেও এর ভিতর অলক্ষ্য অথচ সুস্থির একটা সংযমের প্রণোদনা

আছে যাকে চোখে দেখা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়! কিন্তু পূর্বোল্লিখিত আধুনিক গানগুলির সম্পর্কে কি সেকথা বলা যায়? সেখানে সবটাই যে অনাবৃত, নগ্ন। আর কথার কি স্থূল ভাব! ওই যে একটি গানের পদ উল্লেখ করা হয়েছে যাতে আছে পাছা-পেড়ে শাড়ি হয়ে ঝুলবো তোমার কোমরে—এর চেয়ে অশালীন, অভব্য ভাবের অভিব্যক্তি আর কিছু হতে পারে? অথচ এখনকার বিকৃত রুচির যোগানদার স্থূল কথার কারবারী গীতিকাররা আখ্ছার এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করছেন তাঁদের গানে অবলীলাক্রমে। ভাবতেও লজ্জায় অধোবদন হতে হয়।

অপসংস্কৃতির একটি প্রধান লক্ষণ যে অশ্লীলতা কিংবা যৌনতা, তার ইঙ্গিত সবসময় যে শব্দের ব্যবহারের মধ্যেই থাকতে হবে তার কোন কথা নেই, কখনও কখনও তা শব্দকে ছাড়িয়ে তার নিহিতার্থের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। পূর্বোক্ত গানগুলি ওই ধরনের রচনা। সেগুলির যৌনতার চাতুরী তাদের সাদামাঠা আটপৌরে শব্দ ব্যবহারের মধ্যে হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে সেইসব শব্দের উদ্দিষ্ট suggestion-এর মধ্যে। যেমন ধরা যাক প্রেম করা যে কি সমস্যা / আজ পূর্ণিমা, কাল অমাবস্যা গানটি। এটি আপাতদৃষ্টে কুশলী শব্দমিলের গান বলে মনে হলেও এবং তার ভাব নির্দোষ বিবেচিত হলেও, খতিয়ে দেখলে খুবই যৌনতাগন্ধী রচনা এটি। বলা যেতে পারে রীতিমত অশ্লীল। অমাবস্যায় প্রেম করার অসুবিধা থাকলেও পূর্ণিমার ভরা চন্দ্রকিরণের জোয়ারে প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়, তাদের ভালবাসার আকুলতা বাড়ে। কিন্তু গানের লেখক গভীর জলের মাছ, তিনি পূর্ণিমা অমাবস্যার লোকপ্রচলিত অর্থের কথা মনে রেখে এ পদ লেখেননি, অত্যন্ত চতুরতা ও ধূর্ততার সঙ্গে আরও গভীর কিছু অর্থের ইঙ্গিত করেছেন। সমস্যাটা আসলে প্রেম করার নয়, সমস্যাটা বোধ হয় দেহ মিলনের। এর বেশি কিছু সংকেতিত করতে আমার কলমের কালি লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং এখানেই এ প্রসঙ্গের ইতি ঘটাই।

রবীন্দ্রনাথের গানে আছে—আমি নিশিদিন তোমা ভালবাসিব, তুমি অবসর মত বাসিও। অথবা কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হলো মরি লাজে। এও তো প্রেমের গান অথচ কি চমৎকার তাদের ভাবের আবেদন। এই জাতীয় কথার বাঁধুনিতে প্রেমের পবিত্রতম নির্যাসের সুগন্ধ টের পাওয়া যায়, যৌনতার লেশমাত্র কটুগন্ধ এতে নেই। আর এখন প্রেমের গান মানেই রতিমিলনের গান, 'সংগম' এর গান। এখনও বুঝি কিছুটা সামাজিক বিধিনিষেধ আছে, চক্ষুলজ্জার আব্রু একেবারে খোলাখুলি খসিয়ে ফেলা যায় না, তাই ঠারে-ঠোরে বলবার প্রয়াস। ইঙ্গিত আর সংকেতের আশ্রয়। কিন্তু রেখে ঢেকে বলবার চেষ্টা করলেও উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। যা বোঝবার শ্রোতা ঠিকই বুঝে নেয়। অপ-সংস্কৃতির এক পয়লা নম্বরের ফিরিওয়ালা গ্রামোফোন কোম্পানি শুধু শুধু গীতিকার পোষেন না, পয়সা খরচ করে নাহক গান বাজারে ছাড়েন না। তাঁদের উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার। এইসব গান বাজার থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারলে তবে একটা কাজের মত কাজ করা হয়। কিন্তু কে এ বিষয়ে প্রাথমিক উদ্যোগ নেবেন ?

আমি গীতিরচনা ও সুররচনার বিষয়ে কিছু বলেছি। এবার গায়কের বিষয়ে কিছু বলব। আধুনিক বাংলা গানের যাঁরা কণ্ঠ-শিল্পী, সুররূপকার, তাঁদের বাংলা গানের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না। সানুনাসিক আবৃত্তির ঢঙে তাঁরা কেবল সুরগুলিকে কথার উচ্চারণে গেয়ে যান, রাগ-রাগিণীর ধ্যান-ধারণার কিছুমাত্র পরিচয় বহন করে না তাঁদের গায়ন পদ্ধতি। অথচ এঁদের দাপট কত। পাড়ায় পাড়ায় ছেলে-ছোকরা-মস্তানের দল মাঝে মাঝে ওই যে কী বলে সাংস্কৃতিক 'নাইট' বা বিচিত্রানুষ্ঠানের নাম করে আধুনিক গানের জলসার আসর বসায় তাতে নাকি এইসব শিল্পীদের আনতে গেলে হাজার-দেড় হাজার-দু'হাজার টাকা পর্যন্ত মুজরো দিতে হয়। তার উপরে কাউকে কাউকে আবার হিন্দী ফিল্ম জগতের মক্কা স্বরূপ

বোম্বাই থেকে প্লেন ভাড়া দিয়ে কলকাতায় হাজির করতে হয়। কী বায়নাক্কা! আমি হলে একটি আধলা পয়সাও খরচ করতে রাজি হতুম না এইসব তথাকথিত আধুনিক গানের শিল্পীদের গান শোনার বা শোনাবার জন্য। এঁদের গলায় না আছে সুর না আছে কোন তালিম। কেবল 'স্ট্যাক্কাটো' রীতিতে হেঁচকা টান দিয়ে দিয়ে কণ্ঠস্বর নিক্ষেপ করবার কায়দাটা জানা আছে। এঁদের রাগের জ্ঞান সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল। অথচ কে না জানেন যে রাগের জ্ঞান ছাড়া আধুনিক গানই হোক আর অন্য যেকোন বর্গের গানই হোক কোন গানের প্রতিই গলায় সুবিচার সম্ভব নয়। সাদামাঠা কণ্ঠস্বরে লেপাপোঁছা সরল ভঙ্গীতে গান গাওয়াটা কোন গান নয়, বড়জোর তাকে সুরের আবৃত্তি বলা চলে। এইসব আধুনিক বাংলা গানের গায়কেরা তো গায়ক নন, মামুলি আবৃত্তিকার মাত্র। সুর বিস্তার বা সুর প্রস্তার, যা কিনা গানকে সত্যিকার সুখশ্রাব্য করে, তার বিষয়ে এঁরা এক একজন এক একটি লবডঙ্কা। মুষ্টিমেয় সংখ্যক দু-এক জনার কণ্ঠস্বর বাদ দিলে এঁদের গান আদপে শোনার যোগ্যই নয়।

সুরের মিশ্রণ সম্বন্ধেও ধারণা এঁদের বড় অদ্ভুত। কোন রাগের সঙ্গে কোন রাগের মিশ্রণ গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য, সে সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা পর্যন্ত এঁদের নেই। ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীতের ছাত্র মাত্রেই জানেন যে, ভারতীয় রাগরাগিণীগুলি কতকগুলি জাতি বা মেলে বিভক্ত। এইসব মেলগুলিকে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে দশটি নির্দিষ্ট ঠাট প্রকরণে বিভক্ত করেছেন। সব ঠাটের সঙ্গে সব ঠাটের মিশ্রণ হয় না; হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। হলে সেটা অপকৃষ্ট মিলের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। যেমন সকালের রাগিণী টোড়ি বা ললিতের সঙ্গে রাত্রির রাগিণী কাফি বা খাম্বাজের মিশোল মোটেই ভাল নয়। অথচ এইসব শিল্পীপুঙ্গবেরা হামেশা এইসব বিজাতীয় মিল ঘটিয়ে থাকেন তাঁদের গানে রাগ-রাগিণীর অ-আ-ক-খ না জেনে।

এ সম্বন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম কী বলেছেন সেটা একটু অবধান করা যাক। তাঁর 'নবরাগমালিকা' নামক রাগ-রাগিণী সৃষ্টির যৌক্তিকতা

বিশ্লেষণে সে কাজের ভূমিকাস্বরূপ তিনি লিখেছেন—"আধুনিক গানের সুরের মধ্যে যে অভাবটি সবচেয়ে বেশি অনুভব করি তা হচ্ছে সামঞ্জস্য বা সমতার অভাব। কোন রাগ রাগিণীর মিশ্রণ ঘটাতে হলে সঙ্গীত-শাস্ত্রে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান বা রসবোধের প্রয়োজন তার অভাব আজকালকার অধিকাংশ গানের সুরের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবং ঠিক এই কারণেই আমার নতুন রাগ উদ্ধারের চেষ্টা।"

কথাগুলি অত্যন্ত দামী এবং সমনোযোগে প্রণিধেয়। নজরুল আধুনিক গানের এক অপূর্ব নির্মাণক্ষম স্রষ্টা, তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পরিশ্রুত চিন্তার ফঁসল উপরের কথাগুলি। আধুনিক বাংলা গানের জগতে প্রায়শ অনুসৃত নির্বিচার সুরের মিশ্রণের বিরুদ্ধে তাঁর এই সতর্কবাণী উদ্দিষ্ট মহলে যদি এতটুকু সাড়া জাগাতে সমর্থ হয় তাহলেই একটা কাজের মত কাজ হয়। কিন্তু মুনাফা মৃগয়া সন্ধানী বৈশ্য তান্ত্রিকতার কারবারী আধুনিক গানের পরিচালক ও শিল্পীরা কি নজরুলের এই আর্য উপদেশে কান দেবেন ?

আসল কথা, পাড়ায় পাড়ায় বিচিত্রানুষ্ঠানের ছদ্মাবরণে আধুনিক গানের যেসব মহফিল বা 'মাইফেল' হয় সেগুলি আইন করে বন্ধ করে দিলেও কিছু অন্যায় হয় না। এগুলি অপসংস্কৃতির এক একটি ডিপো বিশেষ। সমাজে বিকৃত রুচি ও অসুস্থ ভাবনা-ধারণা ছড়াবার এক একটি মোক্ষম ঘাঁটি। সুরের আবার ভাবনা-ধারণা কী এই প্রশ্ন যদি কেউ করেন তাহলে তার উত্তরে বলব, যত প্রকার সুকুমার কলা আছে তার মধ্যে সঙ্গীত কলারই সবচেয়ে সংক্রমণ ক্ষমতা বেশি এবং সে সংক্রমণ বিমূর্ত এবং মূর্ত দ্বিবিধ। মূর্ত সংক্রমণের কথায় বলি, সংগীত মানুষের চিন্তা তথা দৃষ্টিভঙ্গীকে পর্যন্ত প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। তার ভাল অথবা মন্দ করার শক্তি অসীম। আধুনিক বাংলা গানের অনিষ্টকারী প্রভাবের কোন সীমা-পরিসীমা নাই। অপসংস্কৃতির সঙ্গে তার গাঁটছড়া বাঁধা। তাই এই প্রবন্ধে সময়োচিত সাবধানবাণী।

শিল্পী সমাজের দক্ষিণা

দৈনিক বসুমতীর বিগত এক কিস্তিতে ডাক্তারদের ফী নিয়ে লিখেছি। এবারে আর এক সম্প্রদায়ের ফী-র অত্যাচার নিয়ে লিখতে মনস্থ করেছি। পাঠক প্রথমটায় আঁচ করতে পারবেন না, আমি কাদের কথা লিখতে চাইছি। কারণ যে সমাজের প্রতিনিধিবর্গ আমার আজকের এই আলোচনার উপজীব্য, তাঁদের প্রতি আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর দুর্বলতা আছে, আছে কমবেশী মমত্ব ও প্রীতির প্রশ্রয়। হ্যাঁ, আমি আপনাদের ওই কী বলে শিল্পীসমাজ, সেই সমাজকেই আজকের এই আলোচনার পরিধির মধ্যে টেনে আনতে চাইছি। ওই যাঁরা চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন, জলসায় বা আসরে গান করেন, 'মুজরো' নিয়ে রঙ্গমঞ্চে কিংবা প্রমোদ-আসরে নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন। শিল্পীরা আমাদের বড়ই প্রিয়, তা তিনি সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীই হোন আর ডাকসাইটে গাইয়ে বা বাজিয়ে হোন, কিংবা নৃত্যশিল্প পটিয়ান বা পটিয়সী হোন। এঁদের কারও কারও জনসমাজে প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি এমন যে, তাঁদের মাথায় করে রেখেই আমরা সন্তুষ্ট হই না, তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করে তৃপ্তি পাই। শিল্পী হলে তাঁর সাতখুন মাপ। কারণ তিনি মানুষের মনোরঞ্জিনী বৃত্তির বেসাতি করেন, মানুষকে নাকি আনন্দ দেন। সুতরাং আর কথা কী। তাঁর আব্দার-আহ্লাদ অন্যায় হলেও আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে বইকি। তাঁর হাজারো রকমের বায়না ও বায়নাক্কা আমাদের মুখ বুজে সইতে হবে বইকি।

এই যে চলচ্চিত্রের খ্যাতনামা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাঁদের তথাকথিত জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে তার অজুহাতে চিত্রনির্মাতাদের ঘাড় মটকান—ফি ছবির অভিনয় বাবদে কেউ দেড় লক্ষ, কেউ দু'লক্ষ, কেউ চার লক্ষ-পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত হাঁকতে কসুর করেন না, তার

অন্তর্নিহিত দুর্নীতি ও অলজ্জতা এতই প্রকট যে, এই নিয়ে আজকের প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই না। পরে কোনও উপলক্ষে এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা করা যেতে পারে। তবে সূত্রাকারে বোধহয় দু-চারটে কথা এখানেই বলে নেওয়া চলে। কারণ বিষয়টি জনস্বার্থ সম্পর্কিত, দেশের সামগ্রিক আর্থিক স্থিতির সঙ্গে জড়িত, নিছক শিল্পীদের উপার্জন-অনুপার্জন ঘটিত ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়।

দুর্নীতিপূর্ণ অভ্যাস

সিনেমা-শিল্পীদের এই অত্যধিক চড়া হারে দর্শনী হাঁকার অভ্যাস দুর্নীতিপূর্ণ এই হেতু যে, এর পুরো টাকাটাই শেষ অবধি বর্ধিত হারে টিকিটের আকারে দর্শকসাধারণের পকেট কেটে আদায় করা হয়। চিত্র প্রযোজক, চিত্র পরিবেশক নামক সিনেমা শিল্পের যে দুটি শ্রেণী আছে তারা অতিশয় ধূর্ত ও চতুর, বিশেষ করে হিন্দী সিনেমা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগণ, এইসব ধুরন্ধর শিল্পীদের ওইসব লিখিত ও অলিখিত (আয়কর ফাঁকি দেবার জন্য প্রায়শঃ অলিখিত) মোটা অঙ্কের দক্ষিণার পুরো টাকাটাই শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের ঘাড় ভেঙ্গে উশুল করেন, সে কথা পূর্বেই বলেছি।

কিন্তু কথা সেটা নয়। কথা হচ্ছে, শিল্পীদের নিয়ে। আমার প্রশ্ন একজন সিনেমার অভিনেতা বা অভিনেত্রী, থিয়েটারের নট বা নটী, যত বড় নামী-দামী শিল্পীই হোন, কী এমন তালেবর ব্যক্তি যে, যেখানে দেশের শতকরা নব্বুইজন মানুষের উপার্জনের হার মাসে গড়ে একশো-সোয়াশো টাকার বেশী পৌঁছায় না, যেখানে সমাজের সাকুল্য জনসংখ্যার ষাট শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন, অর্থাৎ স্রেফ পেটভাতায় কিংবা অর্ধাশনে প্রাণধারণ করতে বাধ্য হন, সেইখানে এইসব বিনোদন জগতের আদুরে দুলাল অভিনয়ের এক-একটা চুক্তিনামার ক্ষেত্রে লাখ-বেলাখ ছাড়া কথা বলেন না?

এঁরা নাকি জনগণমনধন্য সব শিল্পী, তাই এঁদের আব্দার ও আহ্লাদেপনার সীমা-পরিসীমা নেই। এঁদের অপরিমেয় ভোগে-সুখে, আরাম-আয়াসে, বিলাস-ব্যসনে জীবনযাপন করবার অধিকার যেন বিধিদত্ত। কারও সে অধিকারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করবার ক্ষমতা নেই। এমন কি সরকারেরও নয়। সরকারের কর্তাব্যক্তিরাও যেন এঁদের পর্বতপ্রমাণ উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তার সামনে নিতান্ত ম্রিয়মাণ সব জীব। এঁদের শাসন করবেন কী, এঁদের কৃপা-কটাক্ষ পেলে নিজেরাই কৃত-কৃতার্থ বোধ করেন।

এঁদের এই অত্যধিক মুদ্রাপ্রীতি অলজ্জ এ কারণে যে, এঁরা যে পরিমাণ দর্শনী হাঁকেন সে পরিমাণ যোগ্যতা এঁদের নেই। প্রতিভা তো দূরের কথা, যাকে ইংরেজীতে বলে 'ট্যালেণ্ট' তা-ও অধিকাংশের নেই। শুধু কিছু-কিঞ্চিৎ চেহারার জলুস আর ওই জনতার নির্বোধ অনুরাগ এবং উৎসাহের আধিক্য—এই হলো এঁদের মূল পুঁজি। এই ভাঙ্গিয়েই ওঁদের যা-কিছু রবরবা। প্রায়শ এঁদের আকাশছোঁয়া উপার্জনের টাকা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভোগ-বিলাসে ব্যয়িত হয়, কখনও কখনও উচ্ছৃঙ্খলতায় ও উদ্দামতায়। জনজীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে এঁদের সামান্যই যোগ। সেই কারণেই আরও বেশী এঁদের জীবন-যাত্রার ছকটি লজ্জাহীনতায় ঠাসা।

'বিচিত্রানুষ্ঠান'-এর ঢেউ

সিনেমা ও থিয়েটারের কুশীলবদের কথা আপাতত থাকুক। এবারে আমি মনোযোগ ফেরাতে চাই, গাইয়ে-বাজিয়েদের সম্প্রদায়ের অভিমুখে। কলকাতা শহরের পাড়ায় পাড়ায় আজকাল এক ধরনের নতুন উৎপাত দেখা দিয়েছে। এই উৎপাতের নাম 'বিচিত্রানুষ্ঠান'। আর ওই কী বলে 'অমুক নাইট', 'তমুক নাইট'। এই 'নাইট' কথাটির বানান বড় বিচিত্র। রাত্রি অর্থে 'নাইট'-এর যে বানান তার সঙ্গে এই বানানের কোন সম্পর্ক নেই। এই নবোদ্ভূত ইংরেজী

শব্দটির কী যে অর্থ, কী যে দ্যোতনা, তা আমি আজ পর্যন্ত অনেক মাথা খুঁড়েও বার করতে পারিনি। কিন্তু কথাটা দেখছি দিব্যি চালু হয়েছে। একটি বিশেষ বাজারী পত্রিকার ঢাউস-ঢাউস যাত্রা-থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের ফাঁকে ফাঁকে আজকাল এই সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনও বেশ আসর জমিয়ে বসেছে।

ওই বিচিত্রানুষ্ঠান বা তথাকথিত 'নাইট' জাতীয় ব্যাপারটা আসলে কী? পাড়ার কিছু মস্তান ধরনের ছেলে-ছোকরা সহজে পয়সা কামাবার মতলবে আধুনিক গানের জনপ্রিয় শিল্পীদের গিয়ে ধরে। তাঁরা গাইতে স্বীকৃত হলে (তাঁদের নিজেদের শর্তে, বলাই বাহুল্য) সে সংবাদ তারা খবর-কাগজ মারফতে বিজ্ঞাপনের আকারে ফলাও করে প্রচার করে। তারপর যাকে বলে 'পুশ-সেল', সে জাতীয় উদ্যমী বিক্রয় অভিযানের অঙ্গ হিসাবে পল্লীর বাড়ী-বাড়ী, দোরে-দোরে ঘুরে টিকিট বিক্রি করা হয়। ভিন্‌পাড়ার আধুনিক গানের উৎসাহী কাঁচাবয়সী শ্রোতাদের মধ্যেও বিক্রিবাটা মন্দ হয় না। তারপর নির্দিষ্ট দিনের সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়ে যাবার পর যে টাকাটা মুনাফা হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকে, সে টাকাটার সদ্ব্যবহার করা হয় প্রকাশ্য পানভোজনে, কখনও কখনও অপকৃষ্টতর হৈ-হুল্লোড়ে।

গোটা ব্যাপারটাই অপসংস্কৃতির চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারের কোঠায় পড়ে। প্রথমত, পাড়ার অনিচ্ছুক ভদ্রলোকদের বা তাঁদের আধা-ইচ্ছুক সন্তান-সন্ততিদের জোর করে টিকেট গছিয়ে নামীদামী কণ্ঠশিল্পীদের অনুষ্ঠানে আনানোর খরচ যোগাড় করা হয়। দ্বিতীয়ত, এটা সদুপায়ে, স্বীয় সাধু অভিক্রম খাটিয়ে ব্যবসা করার নমুনা নয়; স্রেফ কিছু গাইয়ে-বাজিয়ের জনপ্রিয়তাকে ভাঙ্গিয়ে মুফতে 'টু-পাইস' করার ফিকির। তৃতীয়ত, এর উদ্দেশ্য পরিবারের আয়ের তহবিলে কিছু অতিরিক্ত উপার্জন যোগ করে অপেক্ষাকৃত বেশী পারিবারিক স্বাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের সংস্থান করা নয়; নিছক পানভোজনের মাতামাতি করে উপার্জিত পয়সা ফুঁকে দেওয়া। চতুর্থত ও শেষত, যে জাতীয় গান

এইসব অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয় তার না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু। যেমন কথার ছিরি, তেমনি সুরের ভঙ্গিমা। এ বলে আমায় ত্মাখ, ও বলে আমায় ত্মাখ। কথায় ও সুরে মিলে, সেই সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের কোলাহল যুক্ত হয়ে, সে এক জগঝম্প আসুরিক চীৎকার। গানের জগতে অপসংস্কৃতির কোথায় চর্চা করা হয় আমাকে যদি কেউ সেকথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে আমি দ্বিধাহীনভাবে এই আসরগুলির দিকে অঙ্গুলিনিক্ষেপ করবো। পূর্বের এক প্রবন্ধে বাংলা গানে অপসংস্কৃতির কথা বলেছি। এই আসরগুলিই হলো ওই অপসংস্কৃতি চর্চার মূল ক্ষেত্র।

অবিশ্বাস্য বায়না

কিন্তু এখনও আসল কথা বলা হয়নি। বিচিত্রানুষ্ঠানে কিংবা··· নাইটে সমাদর করে ডেকে আনা এইসব আধুনিক কণ্ঠশিল্পীর ফী-র বহর শুনলে ভিরমি খেয়ে পড়বার যোগাড়। তাও আবার ফী-র পরিমাণ ধরাবাঁধা, একচুল এদিক-ওদিক হবার যো নেই। ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ ফী-র কড়ি যোগাতে পারো তো বাতচিত করো, নয়তো কেটে পড়ো। অনেক স্থলে সেটাও আবার অগ্রিম জোগাতে হবে, বাকীর কারবারে শিল্পীরা নেই। (কী জানি উদ্যোক্তারা যদি শেষ পর্যন্ত পয়সা না দেয়, কিংবা না দিতে পেরে ভেগে যায়, তাদের বিশ্বাস কি!) সুতরাং শিল্পীদের অবধারিত ও অকথিত নীতি : অদ্য নগদ কল্য বাকী।

এই ক্ষেত্রে অন্তত নীতি নির্ধারণে খুব যে তাঁরা ভুল করেন, তা বলা যায় না।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি শিল্পীদের দর্শনী বা প্রণামীর হার শুনলে চোখের তারা উল্টোবার উপক্রম। এঁদের প্রতি অনুষ্ঠানের গানের ফী কারও দু'হাজার, কারও চারহাজার, কারও দশহাজার, কারও তার

চেয়েও বেশী। বোম্বাই থেকে আনতে গেলে অধিকন্তু প্লেনে আনা-নেওয়ার খরচ দিতে হবে। বোঝ ঠ্যালা!

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কী এমন আহামরি গান এঁরা করেন যে, এঁদের ওই অবিশ্বাস্য বায়নার খাঁই মেটাতে হবে? প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে জামাই-আদরে ডেকে এনে এঁদের দিয়ে গান গাওয়ানোর আমি তো অন্তত কোন মানে খুঁজে পাইনে। অবশ্য যদি না এঁদের নাম পুঁজি হিসাবে নিয়োগ করে শ্রোতা আকর্ষণের কৌশল হিসাবে গোটা ব্যাপারটাকেই দেখা হয়—সে কথা আলাদা।

আমার সঙ্গীত জীবনের যৎসামান্য যে স্বল্প অভিজ্ঞতা, তার ভিত্তিতে বলতে পারি, এইসব আধুনিক বাংলা গানের শিল্পীর ওইরূপ চড়া হারে দর্শনী হাঁকবার কোন অধিকারও নেই। যোগ্যতা থেকে অধিকার আসে। সেই যোগ্যতার কোন বালাই এঁদের নেই। এঁদের না আছে রাগ-রাগিণীর জ্ঞান, না আছে সুরের ষত্ব-ণত্বের বোধ। কেবল বিদেশী 'রক-এ্যাণ্ড-রোল' আর পপ মিউজিক-এর ধরনে গলায় হেঁচকি টান দিয়ে কাটা-কাটা স্বরে কণ্ঠনিক্ষেপকেই এঁরা গান বলে চালান। এঁদের সঙ্গীতচর্চার পিছনে দীর্ঘকালস্থায়ী প্রণালীবদ্ধ কণ্ঠসাধনার কোন ঐতিহ্য নেই। কাজেই আ-মাজা গলায় গান প্রায়ই বেসুরে উচ্চারিত হয়। তাছাড়া গানগুলি প্রায়ই আবৃত্তির ঢঙে গাওয়া হয় বলে বেসুরো ভাবটি আরও বেশী প্রকট হয়ে কানে বাজে। এঁদের গানে সুরের কোন মা-বাপ নেই। যে সুরের সঙ্গে যে সুরের মিল হয় না (রাগ-রাগিণীর স্বীকৃত প্রকরণ মতে), সেরকম মিল এঁরা আখছার প্রয়োগ করেন নির্বিচারে। এঁদের একমাত্র ভরসা সুরকানা অথচ গানপাগল নবীন বয়সী শ্রোতৃমণ্ডলীর মূঢ় আগ্রহাতিশয্য। এইসব বিচারহীন শ্রোতার অনুরাগের ঢেউয়ের ফেনায় ফেনায় ভেসে বেরিয়েই এই জাতীয় গায়কদের যা কিছু প্রসার-প্রতিপত্তি।

আমাকে এঁদের গান শুনতে বললে আমি আমার ট্যাঁকের একটি আধলাও এই বাবদে খসাতে রাজি হতুম না।

সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে

ইতঃপূর্বে আমি একবার অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লিখেছিলাম। এবার সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে লিখতে চাই। আপাত বিচারে দুটি বিষয়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে বলে মনে হলেও, পার্থক্যও বেশ কিছু আছে। পার্থক্য এইজন্য যে, দুইয়ের দৃষ্টিকোণে তফাৎ রয়েছে। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযান মূলতঃ নেতিমূলক, পক্ষান্তরে সুস্থ সংস্কৃতির প্রয়োজনের উপর জোর দেওয়া আগাগোড়াই একটা অস্তিবাচক বক্তব্য। এই অস্তিবাচক বা সদর্থক বক্তব্যটাই আজকের আলোচনায় পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে ইচ্ছুক হয়েছি।

সমাজে সুস্থ সংস্কৃতির আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হলে যেটা সবচেয়ে আগে প্রয়োজন, তা হলো পাঠকের মন থেকে আমাদের শিল্প-সাহিত্যের জগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের ধারণাগুলিকে বিদায় দেওয়া এবং তার জায়গায় আগামী দিনের সমাজের মূল্যবোধের আবাহন। বিগত ও বর্তমানের চিন্তাধারাকে আমল না দিয়ে ভবিষ্যতের সমাজে যে চিন্তাধারা জন্ম নেবে তার পথ প্রস্তুত করার জন্য সজ্ঞানে চেষ্টা করে যাওয়াই হবে সুস্থ সংস্কৃতির ভিত তৈরীর অপরিহার্য প্রাথমিক পদক্ষেপ। অর্থাৎ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোর বদল ঘটিয়ে তার জায়গায় নতুন সমাজ ব্যবস্থার ভাবনা মাথায় না রাখলে আমাদের মনে যে সুস্থ সংস্কৃতির কল্পনা রয়েছে তা কখনই বাস্তবে কার্যকর করা যাবে না। বর্তমানের পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোয় বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণারই আধিপত্য, আর বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা মানেই হলো অবক্ষয়ী ধ্যান-ধারণা, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানসিকতাধৃত নানাবিধ ক্ষয়িষ্ণু চিন্তার ক্ষতিকর প্রভাব। যতদিন পর্যন্ত এইসব অবক্ষয়ী ও পচনশীল চিন্তার অনিষ্টকর প্রভাব সমাজে বজায় থাকবে ততদিন সুস্থ সংস্কৃতির আদর্শ বাস্তবে সার্থক করে তোলার স্বপ্ন কথার

কথা হয়েই থাকবে। বর্তমানের লজ্‌ঝর, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঘুণে ধরা সমাজ-কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে সুস্থ সংস্কৃতির জন্য চেষ্টা করা আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন করা ছাড়া আর কিছু নয়। এমনতর সন্ধান মৃগতৃষ্ণিকা সন্ধানেরই নামান্তর।

ভবিষ্যতের সংস্কৃতি

ভবিষ্যতের যে সংস্কৃতির রূপরেখা আমাদের মনশ্চক্ষে বিদ্যমান তার স্রষ্টা এবং ভোক্তা এই উভয় শ্রেণীই আসবে শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের স্তর থেকে। আজকের অনুন্নত শিক্ষাবঞ্চিত সুবিধাভোগী-দের দ্বারা পদে পদে শোষিত শ্রমিক-কৃষক নয়, পরন্তু পরিবর্তিত সামাজিক স্থিতির সুযোগে শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত শোষণমুক্ত নব-জাগ্রত শ্রমিক-কৃষকের সমাজই সম্ভব করে তুলবে যাকে আমরা সুস্থ সংস্কৃতি বলতে চাইছি তার জন্ম। তখন নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা হবে, নতুন ধ্যান-ধারণা উঠবে গড়ে, আর সেগুলির উদ্ভাসিত চেতনার আলোতেই যথার্থ সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তার বিকাশ সম্ভবপর হবে। সংস্কৃতির ধারণাটাই তখন পাল্টে যাবে। কায়েমী স্বার্থ আর স্থিতাবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে আমরা বর্তমানে সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে থাকি। ওই অভ্যাসটারই ঘটবে তখন আমূল রূপান্তর। শ্রেণী-বৈষম্যরহিত তথা উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ বর্জিত ভবিষ্যতের মুক্ত সমাজে শিল্প-সংস্কৃতি আর স্থিত-স্বার্থের হাতে-ধরা হয়ে চলবে না, হবে না রাজা-মহারাজ-ধনিক-বণিক-শাসক-যাজক শ্রেণীর স্বার্থপূরণে নিয়োজিত তাদেরই আজ্ঞাবহ এক হাতিয়ার। একমাত্র ওই অবস্থাতেই সুস্থ সংস্কৃতির প্রস্ফুরণ সম্ভব।

বর্তমানের সমাজে সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার সম্ভব নয় এই কারণে যে, বর্তমান সমাজ যে বুর্জোয়া মূল্যবোধের সংস্কারের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই মূল্যবোধের মূলকথাই হলো অসম চিন্তাধারা, বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী। এখানে প্রেম বলতে বোঝায় নিছক জান্তব দেহসুখাশ্রিত যৌন আবেগ,

সুখ বলতে বোঝায় পরশ্রমার্জিত পরনির্ভর অলস সময়চর্চা ; শিল্পসাহিত্য বলতে বোঝায় সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের গতর-খাটানো উৎপাদনে জীবননির্বাহী পরগাছাস্বরূপ যত রাজ্যের বিলাসী ভোগী কুঁড়ে শ্রেণীর লোকেদের মনোরঞ্জনমূলক সাহিত্য চিত্রকলা নৃত্য সঙ্গীত অভিনয় নাট্য ইত্যাদির চর্চা ; সৌন্দর্যসৃষ্টি বলতে বোঝায় সমাজকল্যাণের সঙ্গে অসম্পর্কিত নিতান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও আত্মরতিমূলক তথাকথিত বিশুদ্ধ আর্টের সেবা। যত রকমের দুর্বোধ্য, জটিল, হেঁয়ালিঘেঁষা শিল্প-প্রহেলিকা সৃষ্টি করা সম্ভব তার সব কিছুতেই এই বুর্জোয়া সংস্কৃতির পরিমণ্ডলের ভিতর প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তার কারণ এতে করে শিল্পকে একটি নির্দিষ্ট কায়েমী স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে সীমিত করে রাখা যেমন যায়, তেমনি অন্যদিকে অগণিত জনমানসকে শিল্প-সংস্কৃতির এলাকা থেকে দূরে রাখাও সম্ভব হয়। আমরা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রায়শঃ যে কষ্টকৃত জটিলতা আর চেষ্টাকৃত দুর্বোধ্যতার সাক্ষাৎ পাই তা আর কিছু নয়, শিল্পরসপিপাসু জনগণকে শিল্পের উপভোগ থেকে বঞ্চিত করবার একটা সূক্ষ্ম কৌশল।

নগ্নতার চর্চা

অশ্লীলতাও বুর্জোয়া সমাজ আশ্রিত পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণার সেবক শিল্পী-সাহিত্যিকদের হাতে অনুরূপ আর একটি হাতিয়ার। চিত্রে ভাস্কর্যে কথাশিল্পে নৃত্যে এমনকি কাব্য-কবিতায় নগ্নতার চর্চা করে এইসব শিল্পীর দল বোঝাতে চান কামই জীবনের একমাত্র কেন্দ্রীয় মূলীভূত সত্য, আর সব সত্যের স্থান জীবনে নিতান্ত গৌণ। কামকে তাঁদের শিল্পে-অনুপাত অতিরিক্ত প্রাধান্য দেবার পেছনে এদের একটা অভিসন্ধিও কাজ করে। সেটা হলো এই প্রতিপন্ন করতে চাওয়া যে, সত্যের পিপাসা, মহত্তের তৃষ্ণা, জীবনের উদ্দেশ্যের সার্থকতার সন্ধান, বহু মানুষের সুখের মধ্যে নিজের সুখকে বিলিয়ে দেওয়ার আকূতি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রোষ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য

অবিরত সংগ্রামশীলতা—এগুলি আসলে কিছু নয়, এই সমস্ত কিছুকে তুচ্ছ করে তাদের ঢেকে রয়েছে জীবনের একমাত্র পরমসত্য সেক্স বা কাম। বুর্জোয়া সমাজের অলস বিলাসী ধনী শ্রেণীর অনিয়ন্ত্রিত ভোগপরায়ণতার অভ্যাসকে সমর্থন করবার গূঢ় মতলব থেকেই যে তাঁদের ভাড়াটিয়া কলম-তুলি-হাতুড়ী-বাটালি চালিয়ের দল এরূপ করে থাকেন একটু চিন্তা করলেই সেটা বুঝতে পারা কঠিন নয়।

টলস্টয় তাঁর 'হোয়াট ইজ আর্ট ?' বইতে বহুতর দৃষ্টান্ত সহযোগে দেখিয়েছেন বর্তমানের অপরিমিত অবসরবিলাসী পরশ্রমজীবী অলস ধনিক ও অভিজাত শ্রেণীর নরনারীদের ভোগের স্পৃহাকে পুষ্ট করে তোলবার জন্যই বর্তমানের শিল্পে-সাহিত্যে কামচিত্রের এত ছড়াছড়ি। জীবন থেকে মহৎকে বৃহৎকে সুন্দরকে আড়াল করে রাখবার এ এক অতি চতুর প্রকরণ, যার একমাত্র লক্ষ্যই হলো মনের প্রবৃত্তিকে নিম্নগামী করে রাখা এবং কখনও তাকে ঊর্ধ্বমুখী হতে না দেওয়া। অন্যপক্ষে দুর্বোধ্যতা ক্ষয়িষ্ণু শিল্পের এক প্রধান অঙ্গ। জনগণের শিল্পে দুর্বোধ্যতার কোন স্থান নেই। জনগণের শিল্প হবে সরল, প্রাঞ্জল, আত্মকেন্দ্রিকতার অভিশাপমুক্ত অর্থাৎ সমাজমুখী। সমষ্টিচেতনায় সমুজ্জ্বল এই শিল্পে সৌন্দর্যের পাশে মঙ্গলের জন্যও একটা বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট থাকবে। এবং সৌন্দর্য ও মঙ্গল উভয়ই সত্যের দ্বারা বিধৃত হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

অন্যপক্ষে লেনিন বলতেন, যাঁরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকার সংস্থান করেন তাঁদের এত অবসর নেই যে কামসংক্রান্ত বিশ্রম্ভালাপ করে সময় কাটাবেন বা ভোগের উদগার তুলবেন। শ্রমশীল জীবনের ছকে এ-জাতীয় অশ্রদ্ধেয় অবসরবিনোদনের কোন জায়গা নেই। শ্রমিক-কৃষকের ঘামঝরানো খাটুনিপূর্ণ দিনযাত্রাই তাঁদের কামায়নসর্বস্ব ক্লেদাক্ত চিন্তার পীড়ন থেকে মুক্ত রাখবার রক্ষাকবচস্বরূপ। সুস্থ পরিশ্রম সকল প্রকার অসুস্থ চিন্তাভাবনার নিশ্চিত প্রতিষেধক। পরের শ্রমে জীবন কাটানো পরভৃতদের জীবনেই শুধু কামের কচায়ন সম্ভব। অপরিমিত, উচ্ছৃঙ্খল, বিকৃত

যৌনাচার পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বল্গাহীন ভোগপ্রবণতারই নামান্তর মাত্র

দুই জাতের শিল্পী

লেখকদের মধ্যে দুই জাতের শিল্পী আছেন। প্রথম জাতের শিল্পী সচেতনভাবে সমাজ বদলের উপায় হিসাবে তাঁর সাহিত্যকে ব্যবহার করেন। যে-সমাজ পর্বতপ্রমাণ অন্যায়-অবিচার-শোষণ-অবদমনের চাপে ভিতরে ভিতরে নিতান্ত জীর্ণ-ভগ্ন হয়ে ধ্বংসের কিনারায় এসে পেঁাছেছে তাকে বাঁচিয়ে রেখে যে আর কারুরই কোন লাভ নেই বরং তার বিনাশ যত ত্বরান্বিত হয় ততই ভাল—এই সত্যের প্রচার করে তিনি বিপ্লবের অনুকূলে কাজ করেন। পক্ষান্তরে আরেক জাতের শিল্পী আছেন যিনি প্রথমোক্ত শিল্পীর মতই বাস্তবতার ছবি ফুটিয়ে তোলেন কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে। সেই ভিন্ন উদ্দেশ্য হলো প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার এবং যাঁরা এই সমাজ থেকে সর্বপ্রকার সুবিধা-সুযোগ ভোগ করছেন তাঁদের মৌরসী-পাট্টা জীইয়ে রাখার অনুকূলে মন্ত্রণা জোগানো। একজন সমাজ বিপ্লবের শিল্পী, অন্যজন স্থিতাবস্থার শিল্পী।

একজোড়া শিল্পী উভয়েই বাস্তবতার অনুগামী হলেও কে কী অভিপ্রায়ে বাস্তবতার প্রয়োগ করছেন তার উপরেই নির্ভর করছে তাঁর শিল্পের উৎকর্ষের তারতম্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তববাদী শিল্পী, সমরেশ বসুও তা-ই। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতার জন্য দুইয়ের মধ্যে কী আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন কোন উপন্যাসে (যথা দর্পণ, অহিংসা, চতুষ্কোণ প্রভৃতি) কামচিত্রণ আছে কিন্তু সে-কামচিত্রণের উদ্দেশ্য হলো এটা দেখানো এই সমাজ ভিতরে ভিতরে পচে-গলে ফোঁপরা হয়ে গেছে, জোড়াতালি দিয়ে তাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। তাকে ধ্বংস করে তার উপর নতুন সমাজের ভিত গড়ে তোলাই হলো বাঁচবার শ্রেষ্ঠ পন্থা।

পক্ষান্তরে বিবর, প্রজাপতি, পাতক, বারবিলাসিনী প্রভৃতি বইয়ের লেখক সমরেশ বসু অশ্লীলতার জন্যই অশ্লীলতা করেন। পাঠকের প্রবৃত্তিকে রিরংসার অভিমুখে চালিত করে সেই সুযোগে সস্তায় পয়সা পেটানো ছাড়া তাঁর লেখার আর কোন উচ্চতর উদ্দেশ্যই দেখা যায় না। পাঠকের নিম্নগামী মানসিক প্রবণতাকে সুড়সুড়ি দিয়ে রগরগে বই লেখা একশ্রেণীর লেখকের কাছে তথাকথিত চাঞ্চল্যকর জনপ্রিয়তা অর্জনের সহজ উপায়। সমরেশ বসু এই দুই শ্রেণীর লেখকদের সর্বশীর্ষে অধিষ্ঠিত। অপসংস্কৃতির কলুষ ছড়িয়ে সমাজমনকে বিষিয়ে তোলার কাজে ক্ষমতার অপব্যবহারে তাঁর তুল্য পারঙ্গম শিল্পী আর কেউ নেই।

কিছুদিন আগে খবরের কাগজের এক ইণ্টারভিউতে সমরেশ বসু বলেছিলেন, অশ্লীলতা বলে কিছু নেই, আমাদের দেশের পাঠকদের পড়াশুনো কম বলে তাঁরা অশ্লীলতা নিয়ে হৈ-চৈ করেন। তাঁদের যদি বিদেশী সাহিত্যের সংবাদ জানা থাকতো…ইত্যাদি। সমরেশের মুখে পড়াশুনোর বাহ্বাস্ফোট—এ একটা জবর খবর বটে। সত্যিই তো, এত বড় বিদ্বান কথাসাহিত্যিক আমাদের মধ্যে আর কে আছেন। তাঁর বিদ্যার গুমরে অন্যদের মূর্খামির লজ্জায় গলায় দড়ি দিয়ে মরবারও জো রইল কী। এখন থেকে আমরা সকলে সমরেশ বসুর কাছ থেকে সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করবো। তাঁর কাছ থেকে আমাদের অনেক শেখবার, জানবার আছে।

এই লেখকপুংগব সম্প্রতি একটি রঙচঙে সাড়ে-বত্রিশভাজা-মার্কা সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'কে নেবে মোরে' বলে একটি গল্প লিখেছেন। সজ্ঞানে এমন গা-ঘিনঘিন করা গল্প যে কেউ লিখতে পারে গল্পটি না পড়া পর্যন্ত বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। একজোড়া দেহাতী যুবক-যুবতীর (তারা স্বামী-স্ত্রী) বডি বিউটিফুলকে ঘিরে কতকগুলি শহুরে উচ্চবর্ণের সমাজের কামাতুর প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার ছিনালপনার কাহিনী। পুরুষ মাতালগুলি মেয়েটার সঙ্গে রাত কাটাতে চায়, স্ত্রী মাতালগুলি জোয়ান মরদটির সঙ্গে। পটভূমি: কলকাতায় কিছু দূরে পূর্বোত্তর

চব্বিশ পরগণা আর নদীয়া জেলার সীমান্তে গ্রামের পরিবেশে এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী। অদূরে একটি বিল। সেই বিল থেকেই ওরা দুজন সাঁতরে উঠে এসেছে।

আমাদের সরকার অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এবং সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে খুবই সোচ্চার। যে সকল পত্র-পত্রিকা এই জাতীয় আপত্তিকর লেখা ছাপে তাদের বিরুদ্ধে সরকারী তরফে কিছু কি করা যায় না? সরকার আর কতকাল সাহিত্যের নামে এই সব নোংরামি চোখ চেয়ে দেখে যাবেন, মুখ বুজে সহ্য করবেন? জনসাধারণের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই সরকারকে শাস্তিমূলক কোন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি।

বিকৃত রুচির বিরুদ্ধে সংগ্রামে চাই গণ-বিক্ষোভ

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সভাপতি প্রখ্যাত চিত্র-প্রযোজক হৃষীকেশ মুখার্জী যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন সাংবাদিকদের কাছে আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন যে, ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের বৈঠকে বিচার্য ছবিসমূহের যে সব বিশেষ বিশেষ অংশকে তাঁরা সাধারণ্যে প্রদর্শনের অযোগ্য বলে নাকচ করে দেন, অনেক সময় দেখা যায় সে সব আপত্তিকর অংশ তাঁদের উপর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কোন্ এক রহস্যজনক প্রক্রিয়ায় খিড়কি পথে ছাড়পত্র পেয়ে যায় এবং রাজধানী ও অন্যান্য জায়গার চিত্রগৃহগুলিতে যথারীতি প্রদর্শিত হয়ে চলে। এটাকে মুখার্জী মশায় ভোজবাজির সঙ্গে তুলনা না করলেও ভোজবাজিরই মত তাক লাগিয়ে দেবার মত এই সংঘটন—এই সেন্সর কর্তৃপক্ষের আদেশনামাকে কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে তাঁদের মুখের উপর তুড়ি মেরে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে রুচিবিগর্হিত বাতিল অংশগুলিকে পর্দার গায়ে প্রতিফলিত করা রূপ দুঃসাহসের ঘটনা। নিয়মভঙ্গকারীরা কোথা থেকে এই দুঃসাহস পায়, কেমন করে, কাদের যোগসাজসে ও প্রশ্রয়ে এই দুঃসাহস সঞ্চয় করে—সে এক মহারহস্য। কিন্তু এর মধ্যে রহস্যই থাকুক আর যা-ই থাকুক, এরকম দুঃসাহসের ঘটনা যে মাঝে মাঝেই ঘটে তাতে কোন ভুল নেই।

এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, চলচ্চিত্র শিল্পে অশ্লীলতা ও অশালীনতার পরিচায়ক বিকৃত রুচিকে পরিকল্পিতভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের দ্বারা তাঁদের মানসিকতাকে নিম্নমুখী করার ব্যাপারে

শুধু সংশ্লিষ্ট চিত্রনির্মাতা আর পরিবেশকরাই দায়ী নন, খোদ সরকারী মহলেই তাঁদের মদত দেওয়ার মত বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি ক্রিয়াশীল রয়েছেন। পর্দার গায়ে সেক্স ও ভায়োলেন্স, যৌনতা ও হিংস্রতার আতিশয্য ঘটিয়ে আত্মরক্ষার উপায়বিহীন সরলমনা দর্শকদের প্রলুব্ধ করে সেই সুযোগে সস্তা পয়সা পেটবার রাস্তা খুঁজে-বার করেছে যে সব নির্বিবেক মুনাফা-শিকারী চিত্র প্রযোজক ও চিত্রপরিচালক, সেই সব দাগী চিত্রনির্মাতার সঙ্গে এই ধরনের সরকারী কর্তাব্যক্তিদের অশুভ আঁতাত শুধু অর্থকরী তাগিদের কারণেই ঘটে এমন মনে করলে ভুল করা হবে। সমস্যাটির প্রকৃতি আরও অনেক গভীর এবং তাকে না বুঝলে কিছুই বোঝা যাবে না।

কী সরকারী স্তরে, কী বেসরকারী স্তরে এদেশের জনজীবনে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা আর্থিক প্রলোভনের প্ররোচনা ছাড়াই সমাজ-সাসারে বিকৃত রুচিকে জীইয়ে রাখায় এক ধরনের অস্বাভাবিক উল্লাস বোধ করে থাকেন। সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, নাট্যে, অভিনয়ে, চলচ্চিত্রে, সঙ্গীতে, নৃত্যকলায় ও অন্যান্য আরও অনেক প্রকার বিনোদনমূলক ক্রিয়াকলাপে অপসংস্কৃতির প্রভাব ছড়িয়ে দিতে পারাকে এঁরা কৃতিত্বের প্রমাণ বলে মনে করে থাকেন এবং ওই বাবদে আত্মশ্লাঘা বোধ করেন। যা-কিছু সুন্দর, সুস্থ ও স্বাভাবিক তাদের প্রতি এঁদের একটা মজ্জাগত বিদ্বেষ আছে এবং সেই জাতক্রোধকে এঁরা প্রকাশ করে থাকেন সর্বপ্রকার রুচিবিকৃতির আনুকূল্য করে।

বিচিত্র মনস্তত্ত্ব

চলচ্চিত্রে অপসংস্কৃতি বা অসুস্থ সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার মূলে এই মনোভাবটাই সমধিক কাজ করতে দেখা যায়—সব সময়েই যে স্থূল বৈশ্য মনোবৃত্তি এ-জাতীয় ঘটনার কারক এমন না-ও হতে পারে।

কিছু লোকই আছে যারা সমাজের শুভবুদ্ধি বা স্বাভাবিক রুচির সংস্কারটাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারাটাকে মস্ত বড় একটা বাহাদুরীর প্রমাণ বলে মনে করে এবং তার থেকে এক ধরনের সাদীয় (স্যাডিস্টিক) আনন্দ অনুভব করে। সরকারী মহলের যে সব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি জেনেশুনে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নিষিদ্ধ জেনেও ছবির চিহ্নীকৃত বাতিল অংশগুলিকে সিনেমা গৃহের পর্দায় বেআইনী-ভাবে দেখতে সাহায্য করেন তাঁরা সব এই জাতের কোঠায় পড়েন।

বলা হবে এ একটা অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব যা কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যেই সম্ভবত সীমাবদ্ধ সুতরাং তাই নিয়ে অতিরিক্ত ভাবিত হওয়ার কারণ নেই। আমরা কিন্তু অত সহজে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। এই মর্বিড বা বিমর্ষ মনস্তত্ত্বের প্রভাব সমাজে অতিশয় ব্যাপক বলে আমাদের ধারণা। শুধু যে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ আমলা-স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যেই এই মনোভাবের প্রভাব দেখা যায় তা-ই নয়, দেখা যায় বুর্জোয়া মূল্যবোধ শাসিত বিচার বিভাগীয় কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে, ব্যবসায়ী মহলে, পুঁজিবাদী পশ্চিমী ধ্যান-ধারণা প্রভাবিত শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে, খবরের কাগজের এক শ্রেণীর লিখিয়েদের মধ্যে, এমনকি শিক্ষা বিভাগও এই বিচিত্র মনোবৃত্তির প্রভাব মুক্ত নয়। সাধারণ মানুষ তাঁদের সহজ সুস্থ বুদ্ধিতে যেটাকে অশ্লীল বলেন, সেইটাই এঁদের বিচারে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠারূপে গণিত হয়। এবং জনসমক্ষে সে কথা প্রচার করে এঁরা এক ধরনের কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহংকারে ডগমগ হন। এঁদের ভাবখানা এই যে, দেখ, সাধারণের বুদ্ধিবৃত্তির তুলনায় আমাদের রুচি কত সুক্ষ্ম ও পরিশীলিত: ওরা যেখানে অশ্লীলতা-যৌনতা ছাড়া আর কিছুই দেখে না, আমরা সেখানে সুন্দরকে আবিষ্কার করি। আমাদের দেখবার চোখ কত গভীরতত্ত্ব সন্ধানী, কত অতলস্পর্শী। বুদ্ধিবৃত্তির তথাকথিত কৌলীন্যের গরিমায় এঁরা মানুষকে মানুষ বলেই জ্ঞান করেন না এবং নিতান্ত অন্যায়ভাবে মনে করেন বিশ্বের তাবৎ জ্ঞান-বুদ্ধি শুধু তাঁদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি।

কিন্তু সাধারণ খেটে খাওয়া পরিশ্রমী মানুষ একক স্তরে শিক্ষা-দীক্ষার অনুন্নত স্তরে বাস করতে পারেন কিন্তু তাঁদের সম্মিলিত বুদ্ধিতে তাঁরা বড় একটা ভুল করেন না। তাঁরা তাঁদের সহজ ধারণায় তাকেই অসুন্দর বলে জ্ঞান করেন যা তাঁদের স্বাভাবিক পরিমিতিবোধকে আঘাত করে; তা-ই তাঁদের চোখে অশ্লীল যা তাঁদের রুচির পীড়ন ঘটায় এবং যা তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বৃত্তের মধ্যে সচরাচর চোখে পড়ে না। কামের যা ধর্ম—নরনারীর স্বাভাবিক মিলনেচ্ছা বা পারস্পরিক ভালবাসার আবেগ—তার তত্ত্ব তাঁরা বিলক্ষণ অবগত আছেন, কিন্তু সেই সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিক ইচ্ছাকে ব্যক্তিবাদী বিকারের স্তরে অবনীত করে ভোগের উদ্‌গারে গা ভাসিয়ে দেওয়া তাঁরা আদৌ বরদাস্ত করেন না। কাম মানে কাম; কাম মানে ধর্ষকাম বা মর্ষকাম নয়। যা কিনা পূর্বোক্ত শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্যের বাতিক-ওয়ালা বৈদগ্ধ্যের বাহ্বাস্ফোটকারী শিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ের চোখে কামের একমাত্র অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিম ইউরোপ আর মার্কিন মুলুকের সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, চলচ্চিত্র আর দূরদর্শনের দৃষ্টান্তে বিহ্বল হয়ে ওই সব 'আঁতেলেকচুয়ালেরা' ধনতন্ত্রের ঔরসে বুর্জোয়া মূল্যবোধের গর্ভসঞ্জাত জারজ শিল্পকেই প্রকৃত শিল্পের মর্যাদা দিয়ে দেশের জনগণকে বিপথে চালিত করবার চেষ্টা করছেন। এঁদের বিকৃত রুচির পরিপোষণ চেষ্টার কুফল সম্পর্কে সাবধান হওয়ার সময় হয়েছে।

পরিকল্পিত চক্রান্ত

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্বতন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগীয় মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সুস্থ সংস্কৃতির উপর প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বোম্বাই মার্কা ফিল্মের রুচিবিকৃতির বিপদ সম্পর্কে এ-রাজ্যের যুব সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দিয়েছেন। খুবই সময়োচিত এ সতর্কবাণী। বোম্বাইয়ের স্টুডিওগুলিতে পাইকারী হারে প্রস্তুত ছবিগুলিতে ভায়োলেন্স আর

সেক্স-এর আতিশয্য ঘটিয়ে সেগুলিকে এমন রগরগে আর রিরংসাপূর্ণ করে তোলা হয় যে, সে-ছবি দেখার অর্থই হলো প্রবৃত্তির নিম্নগামিতা এবং মনের সুপ্ত হিংসাবৃত্তির কৃত্রিম উদ্‌বেজন। এ সব ছবি দেখে যুবসম্প্রদায়ের মানসিকতার অধঃপতন না ঘটেই পারে না। তাঁদের সৃষ্টিশীল জীবনের স্ফূর্তি এবং সংগ্রামী উদ্যম বিনষ্ট করার এ এক পরিকল্পিত চক্রান্ত, যার জন্ম বোম্বাই-এর ম্যালাড অঞ্চলের ছবি বানানোর কারখানাগুলিতে এবং যার কুপ্রভাব এখন শুধু আরব সাগরের উপকূলবর্তী শহরেই সীমাবদ্ধ নয়, বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী মাদ্রাজ শহরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

খুব সম্ভব হৃষীকেশ মুখার্জী এবং তাঁর সেন্সর বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এই ধরনের ছবির ক্ষতিকর প্রভাবটাকেই প্রতিরুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন সেগুলিকে আটকে দিয়ে। কিন্তু দেখা গেল তাঁদের সদিচ্ছাকে পরাস্ত করে তাঁদের উপরেও কর্তালী করার লোক আছেন উপর মহলে, যাঁদের সঙ্গে বোম্বাইয়ের ছবি-বানানে-ওয়ালাদের দহরম-মহরম। কথিত দুই মহলের দুষ্ট যোগাযোগ যে অতি বড় সদিচ্ছারও পরাভব ঘটাতে পারে সে তো হৃষীকেশবাবুর স্বীকারোক্তি থেকেই সপ্রমাণ। সেই জন্যই বোধ করি নিরুপায়তার মনোভাব থেকে তিনি বলেছেন, চলচ্চিত্রের বিকৃত রুচির অভিযানকে প্রতিহত করতে হলে নিয়মতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হয়ে বিশেষ কোন লাভ হবে না, তার জন্য চাই গণ- সংগ্রাম। এই সব অপকৃষ্ট রুচির সিনেমা শিল্পের প্রচার ও প্রসারে জনজীবনের যে-সাঙ্ঘাতিক অনিষ্ট হয়, সেই অনিষ্ট সম্বন্ধে সমাজকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং তাকে প্রতিরোধ করতে হবে সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে। অসুস্থ মনোবৃত্তি সম্পন্ন বিকৃত রুচির শিল্পের বিরুদ্ধে জনমনে প্রভূত বিক্ষোভ জমে ওঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই বিভোক্ষকে এখনও পর্যন্ত সংগঠিত আন্দোলনের আকার দেওয়া যায়নি। গণসংগ্রামের সাহায্যে সেই বাঞ্ছিত কাজটিই এখন করতে হবে। কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সভাপতির বক্তব্যে সেই পথ-নির্দেশেরই ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

গণসংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা

আমরা হৃষীকেশ মুখার্জী মহাশয়ের অভিমতকে সর্বৈব সমর্থন করি। বাস্তবিক, নিয়মতান্ত্রিক পথে অর্থাৎ কমিটি মীটিং ইত্যাদির শলা-পরামর্শ, সেমিনার সিম্পোসিয়াম প্রভৃতির আলোচনা-সমালোচনা, কাগজেপত্রে লেখালেখি তো এযাবৎ যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু তাতে ফল বিশেষ কিছু হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না। শুধু বাক্যব্যয়ই সার হয়েছে। কাজেই রুচিবিকৃতির সর্বব্যাপী কুফলকে রুখতে হলে আরও ফলপ্রদ প্রতিষেধ-ব্যবস্থার দ্বারস্থ হতে হবে। কড়া দাওয়াই না হলে কড়া ব্যাধির জড় নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। সেই জন্যই গণসংগ্রামের পথে প্রতিকার খোঁজার উপায় উদ্ভাবিত হওয়া প্রয়োজন। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে মানুষের মনে দীর্ঘদিন ধরে যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে এবং সুস্থ সংস্কৃতির জন্য তার অন্তরে যে সঙ্গত পিপাসা জেগেছে তাকে সংগঠিত রূপ দিতে হলে গণ-সংগ্রামের রাস্তায় নামা ছাড়া গত্যন্তর দেখা যায় না। একমাত্র সংঘবদ্ধ গণআন্দোলনের মাধ্যমেই বিকৃত রুচির পরিকল্পিত বহুমুখী চক্রান্তকে স্তব্ধ করে দেওয়া সম্ভব।

একটি বিতর্কিত সাহিত্য-প্রসঙ্গ

পত্রিকান্তরে বিতর্কিত লেখক সমরেশ বসুকে নিয়ে আপ্তবাক্যতুল্য কিছু মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছে। দুজন প্রবীণ সাংস্কৃতিক বুদ্ধিজীবী মানুষ ওই আপ্তবাক্যের জনক। এঁদের প্রথমজন হলেন শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার—বর্ষীয়াণ সাহিত্যিক, মননশীল লেখক ও রাজনীতিক। অন্যজন শ্রীযুক্ত চিন্মোহন সেহানবীশ—এককালীন প্রগতি লেখক সংঘ ও ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের অন্যতম কর্মদক্ষ সংগঠক এবং ইদানীং পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ভারতীয় বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ডের নানাবিধ তথ্যসংগ্রাহক।

গোপাল হালদার মহাশয় সহযোগী দৈনিক সত্যযুগ পত্রিকার ১৪ই মার্চ ১৯৮২ (রবিবার) তারিখের সংখ্যায় এক সাক্ষাৎকারমূলক প্রবন্ধে বাংলার প্রগতি সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সমরেশ বসু বর্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁর নিজের কথাই উদ্ধৃত করি, "সমরেশ বসুর বিরুদ্ধে অনেকের অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি সমরেশ এখনকার শ্রেষ্ঠ লেখক।" ঠিক তার পরের রবিবারের সংখ্যায় অর্থাৎ ২১শে মার্চ, ১৯৮২ তারিখের সংখ্যায় চিন্মোহন সেহানবীশ মহাশয় আরেকটি সাক্ষাৎকারমূলক প্রবন্ধে একই প্রগতি সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁর মতামত জানাতে গিয়ে আলোচনার একাংশে বলেন—"আমি মনে করি সমরেশ এখনকার শ্রেষ্ঠ লেখক। ওঁর মত সুস্থ চিন্তাধারা ও শক্তিশালী পেন খুব কম লেখকেরই আছে।"

কাকতালীয় মিল?

দুই ভিন্ন ব্যক্তির মুখে একই লেখক সম্পর্কে পরপর দুই রবি-

বাসরীয় সংখ্যায় এই সার্টিফিকেটের বহর দেখে আমরা কিছু তাজ্জব মানছি। চোখ রগড়ে বারবার নিজেকে শুধোচ্ছি : সমরেশ বসুর প্রশস্তিমূলক অক্ষরগুলি সত্যই চোখের সামনে দেখছি, না সেগুলি মায়া? অথবা দুয়ের সার্টিফিকেটের ভাষায় শব্দের যে-আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটা নিছক কাকতালীয় সাদৃশ্যের উদাহরণ কি? দুজন ব্যক্তি দুই ভিন্ন সময়ে ভিন্ন উপলক্ষে সাক্ষাৎকারকের কাছে প্রগতি সাহিত্যের নানাদিক নিয়ে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে আগ বাড়িয়ে সমরেশ বসুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাঁর সম্পর্কে স্বতঃপ্রণোদিত ভঙ্গিমায় নির্জলা স্তুতি করছেন—গোটা ব্যাপারটাই কেমন যেন ঠেকছে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত বক্তব্য বা মন্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলার থাকলে সেই পত্রিকাতেই প্রতিবাদ পাঠানো সচরাচরের রেওয়াজ। কিন্তু এখানে আমি ভিন্ন পত্রের মধ্যস্থতার আশ্রয় নিচ্ছি। এতে আপাত-দৃষ্টিতে রীতিভঙ্গ হচ্ছে বলে বোধ হতে পারে। কিন্তু নিজ কাজের সমর্থনে কৈফিয়ৎ এই যে, যদি দেখা যায় কোন একটি বিশেষ অভি-মতের প্রভাব ওই পত্রিকাবিশেষের পাঠকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে গোটা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে সেক্ষেত্রে যে-কোন মাধ্যমের আশ্রয়েই তার প্রতিবাদ হওয়া উচিত বলে মনে করি। অধুনা বাংলা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপসংস্কৃতির কুফল নিয়ে সবিশেষ চিন্তা-চর্চা চলছে। বৃহত্তর সমাজজীবনের উপর তার অনিষ্টকারিতার বিষয়ে আজ আর কোন মহলেই বিশেষ কোন মতভেদ নেই। সুতরাং সমরেশ বসু সম্পর্কে যখনই কোন কথা হবে তখনই ওই বিশেষ বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখা প্রয়োজন। কেননা, বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাঠকের ধারণা—তাঁদের মধ্যে বহু বিচক্ষণ গুণীজ্ঞানী ব্যক্তি আছেন—অপসংস্কৃতির বিষ সমাজদেহে ছড়িয়ে তাকে কলুষিত করার কাজে সাম্প্রতিককালের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে সমরেশ বসুর লেখনীই সবচেয়ে বেশী অপরাধী। তাঁকে এক্ষেত্রে "নাটের গুরু" বললেও অত্যুক্তি হয় না।

শক্তির অপব্যবহার

কোন লেখকের "পেন" (চিন্মোহনবাবুর ব্যবহার করা ইংরেজী শব্দটিই রাখলুম) শক্তিশালী হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, কে কী ভাবে সেই শক্তির প্রয়োগ করছেন সেইটাই আসল বিচার্য। শক্তির অপব্যবহারে শক্তির ধার ভোঁতা হয়ে যায় এইটাই পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা। সমরেশ বসুর লেখার শক্তি আমি অস্বীকার করি না. এই সমালোচকই একদা তাঁর 'গঙ্গা,' 'বি. টি. রোডের ধারে' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'অকাল বসন্ত', 'ছেঁড়া তমসুক', 'ষষ্ঠ ঋতু' প্রভৃতি গল্পের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কিন্তু যখন থেকে দেখা গেল সেই একই লেখক মহলবিশেষের অর্থকরী প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে দায়বদ্ধ লেখক হিসাবে সমাজের প্রতি তাঁর দায়-দায়িত্ব ভুলে গিয়ে বাস্তবচিত্রণের অছিলায় অপসংস্কৃতিমূলক গল্পোপন্যাস লেখার কাজে আদাজল খেয়ে লাগলেন এবং পরের পর বিবর, প্রজাপতি, পাতক, মানুষ, বারো-বিলাসিনী প্রভৃতি কদর্য রুচির বই লিখতে থাকলেন, তখন এই সমালোচকই দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের মুখ চেয়ে তার কঠোর প্রতিবাদ না করে পারেননি।

লেখক তাঁর কলমে কতটা শক্তি ধরেন বা না ধরেন সেটা এই ক্ষেত্রে মুখ্য গণনীয় বিষয় নয়, তাঁর সেই শক্তির প্রভাব সমাজের পক্ষে হিতকর কি অহিতকর হচ্ছে সেইটাই আসল ভেবে দেখবার বিষয়। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, লেখক হিসাবে সমরেশের গত দেড়-দুই দশকের ভূমিকা জাতীয় স্বার্থের একান্ত পরিপন্থী ও বৃহত্তর সমাজ-কল্যাণের বিঘাতক।

আমাদের সব কিছু কাজের ভালমন্দ বিচারের মানদণ্ড হওয়া উচিত জনসাধারণের স্বার্থ। জনগণের স্বার্থের বিরোধী বলে প্রমাণিত হলে যে-কোন লেখক এবং তাঁর লেখাকে ধিক্কার জানাবার মত মনোবল দায়িত্বশীল সমালোচকের থাকা উচিত। লেখককে বিগ্রহ বানিয়ে বালগোপালের মত তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে গুতুগুতু করে আদর

জানাবার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। লেখক যতই প্রতিভাবান হোন, বহু বহু মানুষ নিয়ে যূথবদ্ধ যে-বৃহৎ জনসমষ্টি, তার পাশে লেখকের স্থান অতিশয় গৌণ। সাহিত্য নিয়ে আমরা বড্ড বাড়াবাড়ি করতে অভ্যস্ত এবং সাহিত্যের প্রতিনিধি বিশেষকে জামাই আদরে তোয়াজ করতে পারলে আর কিছু চাই না। কিন্তু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সাহিত্য আর দশটা কর্মবিভাগের মত সমাজের অন্যতর একটা বিভাগ মাত্র। তার বেশী কিছু নয়। সুতরাং জনসমাজের মূল্যমানেই তার মূল্যমান বিবেচ্য, তার উপর অতিরিক্ত মাহাত্ম্য আরোপের হেতু দেখা যায় না। এমন যদি হয় যে লেখকবিশেষের লেখার প্রভাবে জনসাধারণের দেহের ও মনের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে, তখনও তাঁকে নিয়ে আঁকুপাঁকু করার যে-প্রবণতা, তাকে আমরা গর্হিত আচরণ বলে মনে করি।

দলীয় গোষ্ঠীপ্রীতি

সমরেশ বসুকে এখনকার শ্রেষ্ঠ লেখক বলে এঁরা অভিনন্দিত করছেন, তাতে কী এসে-যায়? শুধু প্রতিবাদ জানাতে হলো এই কারণে যে, এঁদের এই জাতীয় প্রচারের ফলে পাঠক সমাজের একাংশের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই আশংকাটি নিবারিত হওয়া প্রয়োজন। নয়তো তাঁদের মতকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করার কোনই আবশ্যকতা ছিল না। কেননা এঁদের প্রথম জন গোপাল হালদার একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক, শুধু মহল বিশেষের ঢক্কা-নিনাদে 'সৃষ্টিশীল' সাহিত্যিক বলে প্রচারিত। দ্বিতীয় চিন্মোহন সেহানবীশের সাহিত্য বিচারের কোন এক্তিয়ারই নেই! তাঁর সমরেশ বসু সম্পর্কে মতামত দিতে যাওয়া অনধিকার চর্চার চরম। তার উপর এই গোপাল হালদারই বেশ কিছুকাল আগে পরিচয়ের পৃষ্ঠায় বিষ্ণু দে-কে রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি আখ্যায় আখ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর সেই অভিমত যেমন অবজ্ঞার যোগ্য,

তেমনি তাঁর এই সাম্প্রতিক সমরেশ-ভজনাকেও একই রকম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে গণ্য করলে অন্যায় হয় না। সমরেশ বসুর মহিমা এঁদের এই প্রচারের দ্বারা কতদূর কী পরিমাণ বাড়বে জানি না, তবে এঁরা এঁদের নিজ মর্যাদা খুবই খাট করলেন তাতে সন্দেহ নেই।

সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা

সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার সমস্যা বহু পুরাতন। এই প্রশ্নে আজ পর্যন্ত কোন স্থির মীমাংসায় পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি তার কারণ এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। শুধু যে মত-বৈষম্য প্রশ্নের ঔচিত্য নিয়ে তা নয়, কাকে শ্লীল বলা হবে কাকে অশ্লীল এই নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতামত বহুধা-বিভক্ত। অর্থাৎ শ্লীল-অশ্লীলের সংজ্ঞা নিরূপণের প্রশ্নেও মতভেদের অন্ত নেই।

প্রশ্নটির ঔচিত্য সম্পর্কেই যাঁরা সংশয় উপস্থিত করেন তাঁদের বক্তব্য কতকটা এইরূপ: সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। নানা ভাল-মন্দ শুভ-অশুভ আলো-কালো নিয়ে জীবন। তা যদি হয় তো সাহিত্যেও জীবনের সেই শুভাশুভ মিশ্র রূপের প্রকাশ অনিবার্য। কালোকে আড়াল করে কেবলমাত্র আলোর দিক্‌টি তুলে ধরলে সাহিত্য আর যা-ই হোক জীবনের সত্যকার প্রতিচ্ছবি হবে না। কাজেই মন্দকে বাদ দিয়ে সাহিত্যে চলা যায় না আর মন্দকে সাহিত্যিক স্বীকৃতি দিতে গেলে অবধারিত ভাবে সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রসঙ্গ এসে পড়বেই।

সংজ্ঞার প্রশ্নে মতভেদের যুক্তি কতকটা এই রকম: কোন্‌টা শ্লীল কোন্‌টা অশ্লীল কে তার সঠিক সীমারেখা বাতলে দেবে? এক কালে যা শ্লীল বলে গণ্য অন্যকালে তা অশ্লীল বলে ধিকৃত হয়েছে সাহিত্য-সংসারে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আবার এক কালের অশ্লীল অন্য কালে শ্লীল বলে পরিগণিত হতেও দেখা যায়। শুধু তা-ই নয়, একই কালের সীমার ভিতর শ্লীল-অশ্লীলের মাপকাঠি নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা-কাটাকাটির অন্ত নেই। রুচি-সংস্কার-দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতার কারণ দেশে দেশে এই নিয়ে মতভেদের প্রবলতা তো আছেই। ইংলণ্ডে লরেন্সের 'লেডী চ্যাটারলিজ লাভার' অনেক

কাল নিষিদ্ধ ছিল। সম্প্রতি সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছে। কিন্তু এখনও ভারতে এই উপন্যাসটির উপর নিষেধ বলবৎ আছে। নোবেল পুরস্কার প্রাপক ফরাসী লেখক আঁদ্রে জিদের কোন কোন উপন্যাস ও আত্মকথার অংশ অদ্যাবধি ইংরেজী ভাষায় স্থানবিশেষ বর্জিত না হয়ে প্রকাশিত হয় না। তার অর্থ একই কালের সময়-সীমার মধ্যে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রুচিতে পার্থক্য বিদ্যমান। অন্যদিকে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আজকাল গল্পোপন্যাস, আত্মজীবনী, ডায়েরী প্রভৃতির আবরণে যে ধরনের সব পাঠ্যবস্তু প্রকাশিত হচ্ছে তাতে আমাদের দেশের পাঠকদের পিলে চমকে উঠবার দাখিল। মিলারের 'দি ট্রপিক অব ক্যানসার' বা নভোকোভের 'লোলিটা' এদেশে এখনও রুচিবহির্গত বলে গণ্য, অথচ পশ্চিম ইউরোপে অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ-জাতীয় বই বা তার চেয়েও মারাত্মক ধরনের বই গণ্ডায় গণ্ডায় প্রকাশিত হচ্ছে। সমাজমনের উপর এসব বইয়ের ক্ষতিকর প্রভাবের প্রশ্ন নিয়ে সে দেশের পাঠক সম্প্রদায় তেমন মাথা ঘামায় বলে মনে হয় না।

এসব ক্ষেত্রে আমরা যারা এদেশের সাধারণ পাঠক আমাদের কী করণীয়? আমরা কোন্ পথে যাব? আমরা কী সাম্প্রতিক পশ্চিম ইউরোপ তথা আমেরিকার সাহিত্যাদর্শ গ্রহণ করে এদেশেও ওই ধরনের বইয়ের প্রচার অনুমোদন করব, নাকি, আমরা আমাদের দেশজ সংস্কার বিশ্বাস—এতাবৎ প্রচলিত সাহিত্য-ঐতিহ্যের রাস্তা ধরে চলে পাশ্চাত্ত্যের নির্বিচার দেহমুক্তির আদর্শকে বাধা দেব? এই দুই বিকল্প প্রশ্নের মধ্যে আমাদের একটি বিকল্পকে বেছে নিতে হবে, নয় তো জটপাকানো, বিশৃঙ্খল চিন্তার কবল থেকে আমরা কোন সময়েই মুক্তি পাব না।

শুধু পশ্চিমী সাহিত্যের নজীর তুলে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করাটা কোন কাজের কথা নয়, এদেশের সমাজস্থিতি বিচার করতে হবে, এদেশের অভ্যাস বিশ্বাস রীতি-নীতি প্রথা আচার-আচরণের মান ঐতিহ্য ও সংস্কার—এগুলি হিসাবের মধ্যে অবশ্য গণনীয়। এ

সবের হিসাব না করে কথায় কথায় পশ্চিমের দেহবাদী লেখকদের দোহাই পাড়ার মধ্যে শুধু চিন্তার দৈন্যই প্রকাশ পায় না, আত্মসম্মান বোধেরও অভাব প্রকাশ পায়। যে সব লেখক হীনমন্যতার ব্যাধিতে ভোগেন তাঁরাই শুধু কথায় কথায় পশ্চিমের দৃষ্টান্ত তুলে ধরবার আকুলতা প্রদর্শন করেন। এক সময়ে 'কল্লোল' সাহিত্য পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় যে শক্তিমান নবীন লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাঁদের একাংশ সমসাময়িক পশ্চিমী কথাসাহিত্যের আদর্শে বাংলা গল্পোপন্যাসে নির্বিচার দেহমুক্তির ঘোলাজলের বন্যাস্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের সেই বেহিসেবী কাজের ফল যে বাংলা সাহিত্যের সুস্থ অগ্রগতির পক্ষে অনিষ্টকারক হয়েছে, এমনকি বৃহত্তর সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আজ সে কথা অনেকেই অকপটে স্বীকার করতে আরম্ভ করেছেন। কল্লোল-এর লেখকেরা এদেশের সমাজস্থিতি বিচার না করেই নির্বিচার দেহবাদী প্রবণতার বন্যাকপাট উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাতে বাংলা সাহিত্যের এগিয়ে চলার ছন্দ টাল খেয়েছে, নেশার ঘোরে বিহ্বলচিত্ত লেখক কখনও কখনও ভুলভ্রান্তির খানা-খন্দে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন, নেশার মাদকতা কাটিয়ে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের আত্মস্থ হতে কিছু সময় লেগেছে। কিন্তু তাড়াতাড়িতে হোক কি বিলম্বে হোক শেষ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য আত্মস্থ হয়ে উঠতে পেরেছে। এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে আশার কথা।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাংলা কথাসাহিত্যে যাঁরা দিক্‌পাল লেখকরূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তাঁদের কেউ অশ্লীলতার ধার দিয়ে যাননি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, মনোজ বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়, এমনকি একালের সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এঁরা কেউ অশ্লীলতার সমর্থক নন। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে যাঁদের লেখায় দেহবাদী ঝোঁকের উগ্রতা দেখতে পাওয়া যায় তাঁদের কেউ শক্তিমান্ বা উল্লেখযোগ্য লেখক নন। এ কথার একমাত্র ব্যতিক্রম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহবাদকে আলাদা কোঠায় ফেলে বিচার করতে হবে তার কারণ তাঁর সাহিত্যিক উদ্দেশ্যের সততা। পাঠকের মনে কৃত্রিমভাবে যৌনতার সুড়সুড়ি দিয়ে অর্থোপার্জনের তাগিদে তিনি অশ্লীলতা করেননি, করেছেন সমাজসত্যকে তার অবিকৃত রূপে প্রকাশ করবার জন্য। লেখকের মনোগত অভিপ্রায়ের বিচার দিয়ে তৎসৃষ্ট সাহিত্যের বিচার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন চরিত্রবান ও সৎ লেখক। সাহিত্যের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে তিনি সাহিত্যের বেসাতি করতে যাননি।

যাই হোক, এ কথাটি আমাদের বুঝতে হবে যে, বাংলা সাহিত্যের যে সব লেখক শ্রেষ্ঠ কথাকাররূপে এযাবৎ মর্যাদা পেয়েছেন তাঁরা এদেশের সংস্কার বিশ্বাস রুচির বৈশিষ্ট্যকে মান্য করে সাহিত্যে যৌনতার রূপায়ণকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিনোদিনী চরিত্র, 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের দামিনী চরিত্র বা 'যোগাযোগ' উপন্যাসের মধুসূদন-শ্যামাদাসী সম্পর্ক কিংবা "ল্যাবরেটরী" গল্পের সোহিনী চরিত্রের পরিকল্পনার মধ্যে দেহবাদ আবিষ্কার করেন। এটা ঠিক বিচারক্রিয়া নয়। এসব চরিত্র রূপায়নে রবীন্দ্রনাথ দৃশ্যতঃ দেহবাদের পোষকতা করলেও অপূর্ব শিল্প-মণ্ডিত ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার ভাষায় তাঁর অভিপ্রেত চরিত্ররূপগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে যেখানে জৈব তাড়নায় দামিনী অন্ধকার রাত্রিতে শচীশের পা জড়িয়ে ধরে এলানো কালো চুল ও চোখের জলের বন্যায় দয়িতের পা দুখানি ঢেকে ফেলেছে সে অংশের শিল্পকুশলতার কি কোন তুলনা হয়? শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসকে এক সময়ে অশ্লীলতার নজীররূপে খাড়া করার চেষ্টা করা হত। কিন্তু এ অভিযোগের কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে কিরণময়ীর অবৈধ সম্পর্ক অথবা বর্মা যাবার পথে জাহাজে এক বিছানায় কিরণময়ীর সঙ্গে দিবাকরের ব্যর্থ ঘনিষ্ঠতা প্রয়াসের অপূর্ব শিল্পকুশলী লেখকজনোচিত ইঙ্গিত মাত্র আছে বিশদ বর্ণনা নেই। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলা-সুরেশের এক

রাত্রির মিলনকে বহিঃপ্রকৃতির ঝড়ের উদ্দামতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এখনকার কোন 'বিবর'শ্রয়ী লেখক হলে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার আশ্রয় নিয়ে 'বাস্তবতার' হদ্দ করে ছাড়তেন! সেটা যে জীবনের ছবি সাহিত্যে অবিকৃত রূপে পরিবেশনের শিল্পসম্মত তাগিদে করতেন তা নয়; অসাধু প্রকাশকের সঙ্গে অলিখিত যোগসাজসে পাঠক ভাঁড়িয়ে কিছু অতিরিক্ত পয়সা লুটবার মতলবে করতেন।

এই মতলব বা অভিসন্ধি থাকা না থাকাটাই হল আসল কথা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মতলব ছিল না, তাই তিনি দেহবাদী হলেও, অশ্লীলতার চিত্ররূপকার হয়েও, বাংলা কথাসাহিত্যের একজন প্রধান শিল্পীরূপে অভিনন্দিত। আর 'বিবর'-রচয়িতা এই মতলবের আনুগত্য করায় নতুন সারির লেখকদের মধ্যে শিল্পদৃষ্টিসম্পন্ন শক্তিমান লেখক হয়েও আজ অধঃপতিত লেখকদের সারিতে অবনীত।

লেখকের 'বিবর' উপন্যাসটি পড়লে লেখকের রুচির কদর্যতায় গা ঘিন্‌ঘিন্ করে ওঠে। বন্ধু বা বশংবদ সমালোচক যাঁরা তাঁর এই উপন্যাসটির সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন তাঁরা বলেন এই বইটিতে তিনি নাকি বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র রূপায়ণের সূত্রে অস্তিবাদী দর্শনের তত্ত্ব প্রকটিত করবার চেষ্টা করেছেন। আমার মনে হয় তাঁর এই সব বন্ধু অস্তিবাদী দর্শন-এর নামটাই মাত্র শুনেছেন।

যাক, 'বিবর' ঘেঁটে লাভ নেই। এজাতীয় বইকে উল্লেখের গণ্ডীর মধ্যে আনলেও তাকে অনুপাত-অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া হয়। আমার যেটা বলবার কথা ছিল তা হচ্ছে এই যে, শ্লীল-অশ্লীলের সংজ্ঞা নিরূপণে জাতীয় সংস্কার দ্বারা চালিত হওয়াটাই আসল কথা. এক্ষেত্রে বিদেশী ধার-করা বুলির শরণ নিয়ে উৎকেন্দ্রিকতা তথা উন্মার্গগামিতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

দেহবাদের সমর্থকরা বলবেন, বলবেন কেন, বলেন,—জাতীয় সংস্কারের অজুহাত তোলা হচ্ছে অথচ আমাদের জাতীয় সংস্কারেই সাহিত্যে অশ্লীলতার অনুমোদন আছে। তাঁরা এর প্রমাণরূপে বেদের কোন কোন স্তোত্রাংশ, মহাভারত, কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' ও

অন্যান্য সংস্কৃত কবিদের রচনাবলী, বিশেষ করে অমরুর 'অমরুশতক', বাৎসায়নের কামশাস্ত্র এবং বৈষ্ণব কবিদের শ্রীরাধিকার বয়ঃসন্ধি বর্ণনামূলক ও মিলনানন্দের প্রকাশক কবিতাগুলির উল্লেখ করেন, এদেশের স্থাপত্য-ভাস্কর্য থেকেও প্রমাণ দাখিলের চেষ্টা করেন। উড়িষ্যার মন্দিরগুলির গাত্রদেশে উৎকীর্ণ মিথুনমূর্তি ও খাজুরাহোর অনবদ্য ভাস্কর্য মূর্তিগুলিকে তাঁরা বিগতকালীন ভারতবাসীর সবল জীবনপ্রীতির নিদর্শনরূপে লোকসমক্ষে উপস্থিত করতে চান। বহু অধীত লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর "The Continent of Circe" বইয়ের "Anodyne" অধ্যায়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন ভারতীয়রা অতিশয় ভোগলিপ্সু জাতি এবং তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে একাধিক নজীর আহরণ করেছেন।

এ সবই মানলুম। কিন্তু তার দ্বারা সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য ও কাব্যের রুচির নোংরামিকে সমর্থন করা যায় কিনা তাতে সন্দেহ আছে। আমার এ কথাটা আমি আগেও একাধিক প্রবন্ধে বলবার চেষ্টা করেছি আবারও বলছি: সংস্কৃত কাব্যে আমরা দেহরূপের বা দেহমিলনের যে বর্ণনা পাই তা অপূর্ব শিল্পসুষমায় আবৃত—সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দের ধ্বনির কোমলতায় সেখানে দেহবাদের উগ্রতা ও অসৌন্দর্যকে সজ্ঞানতঃ আড়াল করা হয়েছে। কুমারসম্ভবের যে অংশে হরপার্বতীর বিবাহোত্তর মিলনের চিত্র আছে তা অনবদ্য শিল্প-ব্যঞ্জনার আশ্রয়ে রচিত ও এক উচ্চ অভিপ্রায়ের (শত্রুনিধনের উদ্দেশ্যে দেববাঞ্ছিত কার্তিকেয়ের জন্ম) দ্বারা ধৃত। অবশ্য পণ্ডিতদের একাংশ এটি কুমারসম্ভবের প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে মনে করেন (শ্রী এস. এ. সাবনিস রচিত 'Kalidasa : His Style and His Times' গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য) এবং কবি কালিদাসকে এর রচনাকারিত্বের দায় থেকে অব্যাহতি দেন। কিন্তু কালিদাসই লিখুন আর যিনিই লিখুন এই অংশ তো ভারতীয় কবিরই লেখনীসৃষ্ট চিত্র। তবে কাব্যে দেহবাদ রূপায়ন প্রচেষ্টায় আঁতকে উঠলে চলবে কেন?

এর উত্তরে আমার যা বলবার আগেই বলেছি। দেহবাদী বর্ণনার এবড়ো-থেবড়ো ধার ও রুক্ষ কোণগুলি ধ্বনির শাসনে ভোঁতা করে দেবার কৌশল সংস্কৃত কবিরা জানতেন, তাই তাঁদের কাব্যের অতিদেহবাদী বর্ণনও মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না বরং কাব্যোপভোগকে এক সুন্দর-মধুর জীবনপ্রীতিরসে নিষিক্ত করে তোলে। 'অমরুশতক'-এর অনবদ্য সুন্দর শ্লোকগুলিকে অনেকে অশ্লীল দেহরসাশ্রয়ী বলে মনে করেন। আমার তেমন মনে হয় না। মিলনাকুলতার ও দেহ-মিলনের চমৎকার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাশ্রিত রূপ শ্লোকগুলির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। এখানেও ধ্বনির লাবণ্যের ভূমিকা খুব বড়। বৈষ্ণব কবি-দের বেলায়ও একই কথা বলা চলে। বাৎসায়নের কামশাস্ত্রের কথা অবশ্য আলাদা। সেটি কামশাস্ত্রেরই গ্রন্থ, সুতরাং তার দৃষ্টান্ত থেকে সাহিত্যে দেহবাদ সমর্থনের কোন যৌক্তিকতা নেই। আর মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ মিথুনমূর্তিগুলির কথা এক্ষেত্রে ওঠে না। ভিন্ন প্রসঙ্গে তাদের ঔচিত্যানৌচিত্যের বিচার করতে হবে, সাহিত্যের সঙ্গে ভাস্কর্যকে গুলিয়ে না ফেলাই ভাল।

এবার মহাভারতের প্রশ্ন। মহাভারতে বহু আদিরসাত্মক অংশ আছে। কিন্তু তার দ্বারা এই মহাগ্রন্থের বিচার চলে না। মহাভারত সমগ্র ভারতীয় জাতির বেদ স্বরূপ। একাধারে ধর্মতত্ত্ব আধ্যাত্মিকতা সমাজ-তত্ত্ব রাজনীতি ও রাজ্যশাসন প্রণালীর বিশ্লেষণ কাহিনী নীতিকথা উপাখ্যান গৃহজীবনের আদর্শ লোকনীতি যুদ্ধবিগ্রহ সমরশাস্ত্র প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের সমবায়ে এই দুইলক্ষ শ্লোক সমন্বিত মহাগ্রন্থের কলেবর গড়ে উঠেছে। মানবদেহে ভগবান রূপে কল্পিত শ্রীকৃষ্ণের মুখোচ্চারিত গীতামৃত কথা এই গ্রন্থেরই অংশ। এক অতিসমুচ্চ আদর্শ, যা ভারতের সনাতন মর্মবাণী—জীবনের নশ্বরতা ও ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব—এই মহা-কাব্যের পাতায় পাতায় কীর্তিত হয়েছে। পূর্বেই বলেছি যে, উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব দিয়ে গ্রন্থের সারভূত বিষয়ের বিচার করতে হবে। ধর্মপথের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তনই মহাভারতের মূল উপজীব্য। সুতরাং কোথায় সেই গ্রন্থের এখানে সেখানে সামান্য কিছু অশ্লীলতার অনুপ্রবেশ

ঘটেছে তা-ই দিয়ে এই গ্রন্থের বিচার চলে না। মহাভারতে মানব-জীবনের সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করা হয়েছে, অতএব জীবনেরই প্রয়োজনে তাতে কিছু কামচিত্র স্থান পেয়েছে। যেহেতু কাম জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং জৈব অস্তিত্বের মূলে, সেই কারণে জীবনের অখণ্ড রূপের প্রকাশ যে গ্রন্থের মুখ্য অন্বিষ্ট সেই গ্রন্থে কামকে বাদ দেবার উপায় ছিল না। কিন্তু সেই নজীরে অভিপ্রায়ের বিচার বাদ দিয়ে, যদি যে-কোন ভাল মাঝারি নীরেস বইয়েই কামের রূপায়ণ সমর্থন করতে হয় তবে তো বড় মুশকিলের কথা! আধুনিক উপন্যাসগ্রন্থের চৌদ্দ-আনা অংশেরই না আছে উদ্দেশ্যের সততা, না বা জীবনের অখণ্ড বোধ। তা ছাড়া, কামচিত্রের ব্যঞ্জনাঘন রূপ প্রকটনের জন্য হাতে যে সূক্ষ্ম শিল্পতুলিকা থাকা দরকার সেগুলি এই শ্রেণীর লেখকদের হাতে নেই। এঁরা সাহিত্যে কামায়নের চর্চা করেন তরলমতি পাঠকদের মুখ চেয়ে এবং আর্থিক মুনাফা-মৃগয়ার আশায়। তা-ও যে-ভাষায় করেন সে-ভাষা ধ্বনির সৌষম্যবর্জিত, চাঁছাছোলা, অশালীন। 'ভালগারিটি'র পরুষ-রুক্ষ অমার্জিত চিহ্ন সে ভাষার দেহের উপর দুষ্ট ক্ষতচিহ্নের মত বিরাজমান। যৌন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কিন্তু তরুণ মনের কাছে লোভনীয় বৃত্তান্তের খুঁটিনাটি ছবি এঁকে এঁরা পাঠক পাঠিকাদের টোপে গাঁথতে চান। এসব অপোগণ্ড শ্রেণীর লেখক যখন নিজেদের সমর্থনে মহাভারতের যুক্তি পাড়েন তখন হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারিনে।

আমাদের কোন অগ্রজস্থানীয় বর্ষীয়ান্ অন্যথা-শ্রদ্ধাস্পদ লেখক কিছুদিন আগে 'দেশ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় দেহবাদী তরুণ লেখকদের সমর্থনে এই বলে কাঁদুনি গেয়েছেন যে, সাহিত্য ও কাব্যে যদি শুধু শুদ্ধতারই অনুসন্ধান করতে হয়, জীবনের আলো-ছায়া শুভাশুভের মিশ্ররূপ সাহিত্যে প্রতিফলিত হতে দেখে যদি আঁতকে উঠতে হয়, তবে তো গীতা চণ্ডী ভাগবত পড়লেই হয়, সাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া কেন। সম্প্রতি আমাদের এই দাদা-গোত্রীয় লেখকটির সসমারোহে আশী বৎসর পূর্তির উৎসব পালিত হয়ে গেছে। তিনি শতায়ু হোন।

এই কামনা অবশ্যই করব, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও না বলে পারব না যে, তিনি নবীন বয়সী পাঠকগোষ্ঠীর কাছ থেকে বাহবা নেবার লোভে শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে মিশতে চাইছেন এবং তদ্দ্বারা পাঠককে বিভ্রান্ত করছেন। বৃদ্ধ বয়সে এ 'দ্বিতীয় যৌবন'-এর সাধনা কিনা জানি না, তবে এটি যে অশ্লীলতার সমর্থক মহল বিশেষের কাছে—নিজেকে প্রিয় করে তোলার চেষ্টায় 'playing to the gallery' সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বার্ধক্যের প্রান্তে উপনীত হয়ে দাদা সাহিত্যে যৌনতার নিরাবরণ নগ্নতার অনুকূলে ওকালতি করছেন ভাবতেও কষ্ট হয়।

আরেকজন প্রবীণ বয়সী লেখক, যিনি এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক—তাঁর নামও উহ্য থাকুক—'বিবর' উপন্যাসের উচ্চপ্রশংসা করেছেন এবং তাতেও যথেষ্ট হল না মনে করে তরুণ লেখকদের যে-কোন রূপ প্রবীণের পিলে-চমকানো চেষ্টার সাফাই গেয়েছেন। তিনি বলেছেন 'ব্ল্যাসফেমি' নাকি একটি উচ্চস্তরের সাহিত্যরস। দেহবাদী লেখকেরা যে তাঁদের রচিত সাহিত্যে তথাকথিত অশ্লীলতার অবতারণা করেন সে ভিন্নতর রূপে এই 'ব্ল্যাসফেমির'ই চর্চা মাত্র। এ-জাতীয় ব্ল্যাসফেমির অনুশীলনের দ্বারা পুরাতন মূল্যবোধকে ভাঙার কাজ সহজতর হয়, নূতন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়। শুচিবাইগ্রস্ত মনকে যতভাবে যত দিক দিয়ে ঘা দেওয়া যায় ততই নাকি মঙ্গল।

'বিবর' বা ওই জাতীয় উপন্যাসের প্রসঙ্গে মূল্যবোধের প্রশ্ন তোলা অবাস্তব। অশ্লীলতার চর্চা এবং সেই সুবাদে পাঠকের বিমর্ষ ('মর্বিড') যৌনানুভূতিকে উদ্রিক্ত করে তাঁর কৌতূহলের কৌশলী উজ্জীবনের দ্বারা বইয়ের প্রচারসংখ্যা বাড়ানোর ইচ্ছা ভিন্ন যে সকল গ্রন্থের অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না সেই সকল গ্রন্থের অনুষঙ্গে মূল্যবোধের উল্লেখ হাস্যকর শুধু নয়, রীতিমত preposterous। লেখক যে কথাটা বলতে চেয়েছেন তার নিষ্কর্ষ করলে এইরূপ দাঁড়ায়—পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের ভক্তিশ্রদ্ধা থাকাটা কিছু নয়, ভাই বোনের পরস্পরের প্রতি

স্নেহ একটা সেকেলে ব্যাপার, পত্নীপ্রেম তথা পতিভক্তি একটা কুসংস্কার —এই সব আদর্শকে যত আঘাত করা যায় ততই ভাল। লেখক বয়সে প্রবীণ তদুপরি এই সমালোচকের পরিচিত। তাঁর প্রতি কটু কথা প্রয়োগে অন্তর কুণ্ঠিত হয়। কিন্তু সাহিত্যের কল্যাণের মুখ চেয়ে তাঁকে ধিক্কার জানানো ছাড়া গত্যন্তরও দেখা যাচ্ছে না। এ-জাতীয় ভীমরতির ঘোর-লাগা মানুষের হাতে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত আছে, অন্য অনেক প্রহসনের মত এও এ দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার এক প্রহসন। অন্যথা-সুলেখক এই মানুষটির বিচারমূঢ়তায় অবাক্ হয়ে গেছি। আধুনিকতার বাতিক কি মানুষকে এমন করেই অন্ধ করে!

প্রবীণের কোঠা ছেড়ে এবার নবীনের কোঠায় আসি। এক তরুণ লেখকপুঙ্গব আবার এঁদের উপরে এককাঠি সরেস। তিনি শুধু অশ্লীলতার সমর্থন করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বেশ কায়দা করে 'দেহবাদ' কথাটিকে নিয়ে শব্দের খেলা দেখিয়েছেন। বলেছেন, দেহ বাদ দিয়ে যেমন মানুষের জীবন অর্থহীন তেমনি দেহ বাদ দিয়ে সাহিত্য অর্থহীন। ভায়ার জ্ঞানবুদ্ধি এখনও যথেষ্ট অপরিপক্ক, তাই এমন একটা গুরুতর প্রশ্নে চটুল ঢংয়ে রসিকতার লোভ সামলাতে পারেননি। কিন্তু এঁর জ্ঞানোন্মেষের জন্য বলি, জীবনটা শুধুই কথাসাহিত্য নয়, রম্যতার শূন্যে কল্পকাহিনীর ফুলঝুরি ছিটোনো নয়। মানুষকে স্বেদে-অশ্রুতে দরবিগলিত হয়ে জীবন সংগ্রাম করতে হয়। সে জীবন-সাধনায় শুধু দেহের পিপাসা নয়, জ্ঞানের তৃষ্ণাও আছে, আছে বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মসম্পদের জন্য আকূতি। শুধু বাহিরের দৈহিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে বিমুগ্ধ হয়ে নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্জীবনের শাসন, বিবেকের নির্দেশ মেনে চলতে চলতে মানুষকে জীবনের পথ ধরে এগোতে হয়। জীবনের পরিকল্পনায় দেহ বাদ নয় নিশ্চয়, তবে দেহই সর্বস্ব নয়।

আমার যতদূর জানা, বাংলা সাহিত্যে দুইজন প্রথম সারির লেখক রচনায় সজ্ঞান দেহবাদের পোষকতা করেছেন। তার একজন নাট্যকার,

একজন কথাকার—দীনবন্ধু মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা পূর্বেই বলেছি। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাটকগুলিতে, বিশেষতঃ 'নীলদর্পণ'-এ, জায়গায় জায়গায় চাষীদের নিতান্ত চলতি মুখের ভাষা ('স্ল্যাং') ব্যবহার করেছেন এবং কখনও কখনও তাদের মুখে অশ্লীলতার ধার-ঘেঁষা উক্তি বসিয়েছেন। এ সবই করেছেন তিনি সত্যনিষ্ঠ চিত্রণের খাতিরে, বাস্তবতার অনু-প্রেরণায়। তাছাড়া, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অতি মহৎ। বাংলা দেশের হিন্দু মুসলমান নীলচাষীদের উপর কুঠিয়াল সাহেবদের অত্যাচারের বীভৎসতা প্রকট করে তোলার জন্যই তিনি এই শিল্পনীতি, রুচিবানদের খুঁতখুঁতে বিচারে অগ্রহণীয় জেনেও অবলম্বন করেছিলেন। নীলদর্পণ-এর আদুরী, তোরাপ, ক্ষেত্রমণি চরিত্রত্রয় এই মনোভাবচালিত চেষ্টারই ফলস্বরূপ। চরিত্রগুলি আশ্চর্য সজীব ও জীবন্ত। আদুরীর মুখের কোন কোন ভালোমানুষী সরল উক্তিতে অথবা ক্ষেত্রমণির উপর বলাৎকার চেষ্টার কালে লম্পট রোগ সাহেবের মুখের ভাষায় যে রুচি-অসম্মত ভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তা ওই যুগান্তকারী নাটকের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও মহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে আশ্চর্য মানিয়ে গেছে। অভিপ্রায়ের মহত্ত্ব ও বাস্তবতার প্রতি আনুগত্য 'নীলদর্পণ' নাটকের ওই আপাতঅ-শ্লীলতার মূলে।

কিন্তু এই-জাতীয় যুক্তি কি আজকের কোন গ্রন্থে প্রয়োগ করা চলে? 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে খ্রীষ্টীয় 'ইমাকুলেট কনসেপসন' তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে লেখক অযথা অশ্লীলতার আশ্রয় নিয়েছেন, অথবা 'লালকেল্লা' উপন্যাসে ঘটনার ধারাকে ইচ্ছাপূর্বক বার বার যৌনতার কিনারায় নিয়ে গেছেন, এমনভাবে চরিত্র পরিকল্পনা করেছেন যাতে ওই সব চরিত্রের রূপায়ণ চেষ্টায় মুখরোচক বর্ণনার আশ্রয় নেওয়া যায়। এ সবই করা হয়েছে ব্যবসায়িক তাগিদে—প্রমথনাথ বিশীর মত একজন বহুমুখী প্রবীণ সুদক্ষ লেখকের সত্তার সঙ্গে এই স্থূল বৈষয়িক প্রবণতাকে মেলাতে বড় কষ্ট হয়।

আর একজন জনপ্রিয় গল্পকার শ্রীবিমল মিত্র তাঁর 'বেগম মেরী বিশ্বাস'

উপন্যাসে ইতিহাসের আপাত-আশ্রয়ে পুরাতন মুর্শিদাবাদ নবাব বাড়ীর বেগম মহলের গল্প ফেঁদেছেন। ছদ্ম-ইতিহাসের তবক মুড়িয়ে এ নবাব-ঘরের হারেমের কেচ্ছা-কাহিনী পরিবেশনের কৌশলী চেষ্টা মাত্র। শ্রীমিত্রের রচনার উদ্দেশ্য যাই হোক তাঁর গল্প জমাবার ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতার জোরে তিনি কাহিনীটিকে চিত্তাকর্ষকভাবে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর অজ্ঞাতসারে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের কী ক্ষতি করেছেন তার কোন ধারণা তাঁর এবং অন্যদের নেই। সেই যে তিনি বেগম ও বাঁদীদের নিয়ে কাহিনী রচনার রেওয়াজের সূত্রপাত করেছেন, তার পর থেকে এই অভ্যাস একটি সংক্রামক ব্যাধির মত আমাদের একালীন লেখকদের একাংশকে পেয়ে বসেছে। দেখতে দেখতে হারেমবাসিনী অসূর্যম্পশ্যা বেগম ও বাঁদীদের কল্পিত আধা-কল্পিত কেচ্ছা নিয়ে কত যে মোটা মোটা উপন্যাস লেখা হয়ে গেল তার আর ইয়ত্তা নেই। এই সব স্থূল ব্যবসায়িক সাহিত্য প্রয়াসের দৌরাত্ম্যে সাহিত্যের সামগ্রিক আবহাওয়াটাই কলুষিত হবার উপক্রম হয়েছে। সাহিত্যের শুচিতার সংস্কার, মননজীবিতার সংস্কার চাপা পড়তে আর বাকী নেই।

কবিতায় 'হাংগ্রি' আর 'অ্যাংগ্রি'দের তৎপরতার কথা সবাই জানেন। কিছুকাল আগে পর্যন্ত এঁদের রুচিবিকারের দৌরাত্ম্য সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের উৎপাতের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। সেই সঙ্গে ছোটগল্পে 'চৈতন্যের স্রোত' (হেনরি জেমস-প্রবর্তিত ও 'ইউলিসিস' উপন্যাসের স্রষ্টা জেমস জয়েস-প্রযুক্ত 'স্ট্রীম অব্ কনশাসনেস' নামীয় সাহিত্যিক তত্ত্ব) পরিবেশনকারী নতুন লেখকদের উৎকেন্দ্রিক চেষ্টা যুক্ত হয়ে, সেই উৎপাতকে আরও ভয়াল করে তুলেছিল। সুখের বিষয়, এ-জাতীয় বিপথগামী চেষ্টায় অধুনা ভাঁটার টান লেগেছে এবং কেউ কেউ এ পথ থেকে একেবারেই সরে গেছেন। কিন্তু এখনও পুরাপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। যে-কোন সময় 'হাংগ্রি'দের বেপরোয়া কাব্য-তরণী চালনা পালে অনুকূল বাতাস পেলে আবার অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারে এবং তার বেগে দুরন্ততা দেখা দিতে পারে। 'হাংগ্রি' ও 'অ্যাংগ্রি'রা কাব্যে অশ্লীলতার

চিত্রায়ণে আক্রর ধার ধারেন না। জীবনের কুৎসিত সত্যকে চাঁচাছোলা ভাবে নিষ্ঠুর অভব্যতায় প্রকাশ করাকেই তাঁরা তাঁদের কাব্যের পরমার্থ বলে মনে করেন। এ বিষয়ে মার্কিনী 'বীট' কবিরা তাঁদের পথ-প্রদর্শক, তাঁরা তাঁদের সাগরেদি করছেন মাত্র। বেশ কয়েক বছর আগে পরিচিত 'বীট' কবি গীনস্‌বার্গ কলকাতায় বেড়িয়ে গেছেন, তাতে তাঁরা আরও বেশী মদদ্ লাভ করেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁদের পথ যে ভুল পথ, বিচার-বিপর্যয়ের পথ, একটু বয়স হলেই তাঁরা সে কথা বুঝতে পারবেন। তারুণ্য হয়তো সৃষ্টিশীল আবেগের স্ফূর্তির কাল, কিন্তু বিচারের স্থৈর্যের জন্য বোধ হয় কিছু বয়ঃপ্রবীণতা দরকার। বয়স হলেই তাঁদের বল্গাহীন অসংযম থিতিয়ে আসবে বলে মনে করি।

কবিতায় এঁরা নিরাবরণ, নগ্ন ভাষার আশ্রয়ে অশ্লীলতা করেন অথচ এঁরা জানেন না সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা আর ধ্বনির আশ্রয় নিলে একই জৈব বিষয় কত শিল্পসুন্দর ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে অথচ অভীষ্ট বক্তব্যটি অনুক্ত থাকে না। এইরূপ ব্যঞ্জনাশ্রিত ইঙ্গিতধর্মী শিল্প-শ্রীমণ্ডিত কবিতার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, তার থেকে পাঠক দেখতে পাবেন জৈব কামের চিত্রকেও কত মনোজ্ঞভাবে পরিবেশন করা যায়, যদি উপযুক্ত শিল্পজ্ঞান, সংযম ও ভাষার উপর দখল থাকে। প্রবীণ কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের একটি কবিতাংশ :

ভালবাসার নিস্তল দিঘিতে
ঢেউ তোলো,
মাটির তলায়
শেকড়-কাঁপানো ঝড় তুলে
হিমবাম পর্বতকে করো অগ্নিগিরি।

তারপর উর্বরা হও।
জ্বলন্ত ভবিষ্যতের সুমহান সম্ভাবনায়
হও জিয়ন্তনা!
সব চেয়ে বড় লজ্জাকে

সলজ্জ-গৌরবে ধারণ করো
সবচেয়ে বড় আনন্দের অন্ধকারে।

["সলজ্জ গৌরব," 'রক্তগোলাপ']

মিলনচিত্রের সব কথাই বলা হয়েছে অথচ কত শিল্পকুশল ভাষায়ই না তা বলা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যে কয়েকজন লেখক জেনেশুনে অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। এঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে লিখতে আমার সংকোচ বোধ হয়। এঁরা বেশ কিছুকাল যাবৎ এঁদের কুৎসিত মনোবৃত্তির অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। অচেতন পাঠকের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অনুচিত উপায়ে অর্থ আহরণের এক ফলাও ব্যবসা ফেঁদেছেন সম্পাদক-লেখক-প্রকাশকের এক মিলিত চক্র। অনেক দিন আগে সাপ্তাহিক 'দেশ'এ "বুনো ওল" নামক একটি গল্প বেরিয়েছিল। এমন কদর্য রুচির গল্প যে কেউ লিখতে পারে তা এই রচনাটি না দেখা পর্যন্ত অভাবিত ছিল। বেশ বুঝতে পারা যায়, এ জেনেশুনে পাঠককে ফাঁদে ফেলবার নির্লজ্জ প্রয়াস। পোর্নোগ্রাফীও এর কাছে হার মানে। সমাজের মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন, সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষায় যাঁদের উদ্বেগ খাঁটি, তাঁদের এ সম্পর্কে আশু কোন প্রতিকার-ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। সমরেশ বসুর সাম্প্রতিক গল্প "কে নেবে মোরে" আর একটি ন্যক্কারজনক উদাহরণ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের কি এ বিষয়ে কিছু করবার নেই? এই শ্রেণীর পত্রিকা এবং এই সব লেখকের বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারের বাধা কোথায়? সরকার অসহায় দর্শকের মত নির্বিকার চোখে এসব প্রত্যক্ষ করে যাবেন এ রকম হলে সরকারের জনপ্রতিনিধিত্বের গৌরব আর থাকে না।

ভাববেন না অতিরিক্ত শুচিবাইয়ের বশে এ সব কথা লিখছি। মিড্ভিক্টোরীয় মনোবৃত্তি বা সুনীতিবাদের আত্যন্তিক খুঁতখুঁতেপনা আমার এ প্রবন্ধ রচনার মূলে সক্রিয় নয়। বরং তার বিপরীত।

একান্ত প্রগতিশীল মনোভাব থেকেই আমি অশ্লীলতার বিরুদ্ধে বলছি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, অশ্লীলতা প্রগতিশীল তো নয়ই, সুস্পষ্টরূপে প্রতিক্রিয়াধর্মী। এ অবক্ষয়ের লক্ষণযুক্ত, আত্মকেন্দ্রিক, গণজীবনের সুস্থ ধ্যান-ধারণার সঙ্গে অসম্পর্কিত। আতিশয্যমণ্ডিত আত্মরতির স্পৃহা থেকে এর জন্ম। মানুষের সামূহিক জীবনের কর্মকাণ্ডের বৃত্তের মধ্যে এর প্রবেশাধিকার নেই। পশ্চিম ইউরোপ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলুষিত ধনতান্ত্রিক আবহাওয়াতেই শুধু এই জাতীয় অবক্ষয়ী সাহিত্যের জন্ম হওয়া সম্ভব ; পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহিত্যে এর ছিটেফোঁটা প্রভাবও দেখতে পাওয়া যাবে না। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট সাহিত্যে অশ্লীলতা আইনতঃ নিষিদ্ধ না হলেও যেহেতু সে দেশের জীবন কর্মভিত্তিক এবং সে কর্মের প্রকৃতি গঠনমূলক ও সার্বজনিক, সেই কারণেই সে দেশের সাহিত্যে অশ্লীলতার জায়গা নেই। অশ্লীলতার কারবার করে পশ্চিমের পচাগলা ধনতন্ত্রের উচ্ছিষ্টবাহী দেশসমূহের লেখকবৃন্দ, যুগচেতনায় উদ্বুদ্ধ সমাজতন্ত্রী লেখকেরা এ বস্তুকে আমল দেয় না। যাঁদের জীবন রচনাত্মক তাঁদের এত প্রেমচর্চার এবং মন দেওয়া নেওয়ার বিলাসের চিত্র আঁকবার অবসর নেই, ইচ্ছাও নেই। মানুষকে তাঁরা প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, তাঁদের সাহিত্যকেও তাঁরা সেইভাবে রূপ দিতে সচেষ্ট। আমি মনে করি এমনতর সুস্থ আদর্শের বোধ আমাদের সাহিত্যেও প্রতিফলিত হওয়া দরকার। বাংলা সাহিত্যের আবহাওয়ার সেই বাঞ্ছিত পরিবর্তনের জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকব।
